নব কমলাকান্ত

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

প্রাপ্তিস্থান :

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

২, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা—১২

নব কমলাকান্ত

* * *

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

* * *

টি কে ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং

৬এ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

MAHARAJA BIR BIKRAM COLLEGE
2243.
LIBRARY.
* Agartala. *

প্রকাশক—
শ্রীঅমিয় রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
২নং কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : বৈশাখ, ১৩৫৭ সাল

মূল্য—এক টাকা আট আনা

মুদ্রাকর—
শ্রীসুবোধ কুমার পাল
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
৫৯সি, বেচু চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রীতিভাজন

শ্রীসোমেশ্বর পাকড়াশী

করকমলেষু—

সূচীপত্র

বয়েস হয়েছে	১
প্রিয়ে শোন শোন	১১
আমি একা	২৩
মহাপ্রলয়ের দিনে	৩২
জীবন-প্রবাহ	৩৬
একটি প্রেমের গান	৪৫
গীতি-কবিতা	৫৫
ভারত-ইতিহাসের খসড়া	৬৪
সামাজিক নীতির নমুনা ...	৭৪
অবগুণ্ঠন	৮৬

COLLEGE ... Y.

শুদ্ধিপত্র

৩২	পৃষ্ঠা	১৪	লাইন	স্নন্দবিহীন	স্থলে	স্পন্দবিহীন	হবে
৩৩	„	৩	„	তাই	„	তার	„
৩৪	„	১৬	„	জন মণ্ডল	„	জল মণ্ডল	„
৪৬	„	১৩	„	সেথা নেই	„	সেখানেই	„
৫৯	„	২০	„	ঐ	„	সে	„
৬৭	„	১২	„	আছে	„	আজ	„
৭৯	„	১০	„	ডাকতে	„	ডাকাতে	„

বিজ্ঞাপন

এই গ্রন্থের "একটি প্রেমের গান" ও "ভারত ইতিহাসের খসড়া" শীর্ষক লেখা দুটি আমার পূর্ব-প্রকাশিত পুস্তক "সবুজ কথা" থেকে নেওয়া। বাকি লেখাগুলিও বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে "জীবন-প্রবাহ" "বিজলী"তে, "প্রিয়ে শোনো শোনো" ও "গীতি-কবিতা" এই দুটি "সবুজ পত্রে" এবং বাকি সবগুলিই "আত্মশক্তি"তে ছাপা হয়। এই নিবন্ধগুলির সবই ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বেকার রচনা।

এই নিবন্ধগুলির কয়েকটি "নব কমলাকান্ত" এই নাম শিরে বহন ক'রে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তা থেকেই হয়েছে এই গ্রন্থের নামকরণ।

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী।
২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

এই লেখকেরই লেখা—

কবিতা

শ্রীঅরবিন্দ

সন্ধ্যালোকে

ইন্দ্রধনু

সাকী

গল্প

সাগরিকা

ঐন্দ্রজালিক

ইরাণী উপকথা

নতুন রূপকথা

প্রবন্ধ

উড়ো চিঠি

সবুজ কথা

নবযুগের কথা

নব কমলাকান্ত

বয়েস হয়েছে

বয়েস হয়েছে। যদিও চুলে পাক ধরেনি, একটিও দাঁত পড়েনি, চর্ম লোল হয়নি তবুও টের পেলাম বয়েস হয়েছে। কেননা খেলবার মাঠে ঐ যে তরুণের দল, কিশোরের দল যাদের কলকণ্ঠ হতে হাসির গিটকিরি কারণে অকারণে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পুলক লাগে, চিত্ত চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, হাত পা কোন ক্রমেই স্থির থাকে না, তারা আজ আমাকে শ্রদ্ধা করতে স্থুরু করেছে। তাই বলছিলাম যে বয়েস হয়েছে।

কেননা তরুণ মনের, কিশোর মনের ঐ যে শ্রদ্ধা, ঐ শ্রদ্ধাই তাদের রাজ্য থেকে আমার নির্বাসনের আদেশ পত্র। তাদের মনের শ্রদ্ধা আজ আমাকে এই কথাটাই বল্‌তে চায় যে তাদের প্রাণের পুলকে আর আমার প্রাণের পুলকের সঙ্গে কোন যোগ থাকা আর সম্ভব নয়। তাই আমার সান্নিধ্যে তাদের কলকণ্ঠ-উচ্ছ্বসিত হাসির গিটকিরি সহসা থেমে যায়, তাদের চঞ্চল চিত্ত ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে, তাদের হাত পা আর কোন ক্রমেই ক্রীড়ারত থাক্‌তে চায় না। শ্রদ্ধার এই ব্যবধান—এ ইঁট চূণ শুরকির দেয়ালের চাইতেও বাস্তব। এমন কোন মাংসপেশী নেই,

এমন কোন খননাস্ত্র নেই যা এই দেয়ালের ব্যবধানকে ধূলিসাৎ ক'রে দিতে পারে। মনোজগতের এই ব্যবধানকে দুর্গপ্রাচীর ক'রে কিশোর আজ আদেশ পত্রে সই দিয়ে ব'সে আছে, যে আদেশপত্র বল্‌ছে তোমার স্থান আর যেখানেই থাক্ সেটা এখানে নয়। আমাদের অকারণ পুলকের রাজ্য, এই সহজ হাসির লীলা, অস্থির চিত্তের অর্থহীন চাঞ্চল্য, এখান থেকে তোমার চির নির্বাসন। আজ থেকে এরাজ্যে তোমার যা প্রাপ্য সেটা অনুরাগ নয়—সেটা হচ্ছে শ্রদ্ধা। তাই বল্‌ছিলাম—বয়েস হয়েছে।

কিন্তু প্রভেদ আছে। এ বয়েস সে বয়েস নয় যখন মানুষের মনেপ্রাণে এই কথাটাই সত্য হয়ে ওঠে—"আর অরণ্যের বাকি কি?" যখন লোকে দেখে যে, যে দাসু মিত্র একদিন যৌবনের রূপে স্ফীত-কণ্ঠ কপোতের ন্যায় সগর্বে বিচরণ করত—যাকে দেখে কত রমণী গঙ্গার ঘাটে স্নান কালে "নমঃ শিবায় নমঃ" ব'লে ফুল দিতে "নমঃ দাসুমিত্রায় নমঃ" ব'লে ফুল দিয়েছে, একটি ব্রাণ্ডি আর তিনটি মুরগী যার জলপানের মধ্যে ছিল—সেই দাসু মিত্র আজ পলিতকেশ, দন্তহীন, লোলচর্ম ; কেবল মাত্র একখানি নামাবলীভরে কাতর, পাতে মাছের ঝোল দিলে পাত মুছে ফেলে—আর বলে "আর অরণ্যের বাকি কি?" এ বয়েস সে বয়েস নয়। 'যখন লোকে দেখে যে, যে-তরঙ্গিনী একদিন শ্রোণিভার-মন্থরা গজগতিতে ফুল চুরি করতে যেত আর মনে হত যেন কে নন্দন-কানন হতে সচল স-পুষ্প পারিজাত বৃক্ষ এনে ছেড়ে দিয়েছে,

যার অলকদাম নিয়ে উদ্যানবায়ু ক্রীড়া করত, অঞ্চলে কাঁটা বিঁধে দিয়ে গোলাপ-গাছ রসকেলি করত—সেই তরঙ্গিনী আজ গদার মা-রূপে বকাবকি করতে করতে চাল ঝাড়ছে—মলিন বসনা বিকট দশনা তীব্র রসনা—দীর্ঘাঙ্গী কৃশাঙ্গী কৃষ্ণাঙ্গী লোলচর্ম পলিতকেশ শুষ্কবাহু কর্কশ-কণ্ঠ—আর বলে—"আর অরণ্যের বাকি কি?" এ বয়েস সে বয়েস নয়। কিশোরদের অকারণ পুলকের রাজ্য থেকে নির্বাসন হয়েছে বটে কিন্তু সেটা মৃত্যু যবনিকার কৃষ্ণছায়া যে দেশকে অশ্রুভারাক্রান্ত ক'রে তুলেছে সে দেশে নয়।

এ বয়েস সেই বয়েস যখন সংসারকে অরণ্য ব'লে মনে হয় না—মনে হয় উদ্যান ব'লে। যখন মানুষ বলে না, "আর অরণ্যের বাকি কি?" কিন্তু বলে—এই জীবন-উদ্যানের শেষ কোথায়? জীবনের এই উদ্যান যেখানে সুখ সুখের দুঃখ সুখের যেখানে হাসি উপভোগ্য অশ্রু উপভোগ্য—যেখানে আকাঙ্ক্ষার পিছে পিছে শক্তি এসে উদয় হয়, মর্ত্য প্রাণের দুর্বার বাসনার সঙ্গে সঙ্গে পেশীতে পেশীতে পুলক লাগে, ধমনীতে ধমনীতে শোণিত ক্ষিপ্রতর-গতি হ'য়ে ওঠে, মন বল্‌তে থাকে আমার অসাধ্য অগম্য অজেয় কিছু নেই, কিছু নেই, কিছু নেই। জীবনের এই উদ্যান যেখানে ফুল ফোটে, ফল ধরে, পাখি গায়, অলি গুঞ্জন তোলে, যেখানে প্রেম, প্রীতি, সখ্য, ভালবাসা, বিরহ মিলনের, অপূর্ব ঝঙ্কারে চারিদিক নবতর রূপ ধারণ করেছে—যেখানে জীবনের রসে সব কিছুই সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠেছে, মর্ত্য প্রাণের মত্ত মদিরার সিঞ্চনে যার পুষ্প-পল্লব মাতাল হ'য়ে উঠেছে, মনের

মাধুরীতে যার অন্তর বাহির মোহন হ'য়ে উঠেছে। এ সংসার—অরণ্য নয়, এ সংসার—উদ্যান। এ অরণ্যের নির্লিপ্ততা নয়, এ উদ্যানের মায়া। এ বিগতরুচি বৈরাগ্য নয়—এ নব আবিষ্কৃত জীবনের একটা অপূর্ব-উপলব্ধ ছন্দের দুর্বার আকর্ষণ। এ বিগত-স্পৃহের করুণ বিলাপ নয়, এ নব-সামর্থ্যের বিজয় আকাঙ্ক্ষা। আসলে এ বুড়া বয়েসের কথা নয়, এ নব-যৌবনের কণ্ঠস্ফুট মোহন রাগিণী।

এ বুড়া বয়েসের কথা নয়—এ নব যৌবনের কথা। তাই সেদিনকার পুঁটু যে মাজায় কাপড় বেঁধে আমাদের চাল্‌তা তলায় এসে উপরে নিচে গোটাচারেক দাঁত পড়া সত্ত্বেও মনের সুখে কাঁচা পেয়ারা খেত, আর ওবাড়ির টুনুর সঙ্গে জিভ বার ক'রে ভেংচি কাটত—দেখি আজ তার নাম শরৎ সুন্দরী—আলু-লায়িত-কুন্তল, বিদ্যুৎদৃষ্টি, রক্ত-ওষ্ঠাধর, উদ্ভিন্ন-যৌবন-বক্ষ, মন্থরগতি—আনন্দময়ী সুতরাং আনন্দদায়িনী—সঙ্গীতময়ী সুতরাং রাগবাহিনী—নবযৌবনা, সুতরাং নবযৌবন-সঙ্গিনী। এ যৌবনের কথা। তাই আজ চোখে পড়ে দিকে দিকে বালিকা কুঁড়ি সব বিকশিত হ'য়ে কিশোরী পুষ্প-রূপে ফুটে উঠেছে আপনাদের রূপ ও সৌরভ ছড়িয়ে। সেদিনের বুড়ি, বুলি, পেন্‌কি আজ সব বাসন্তিকা, মাধবিকা, নিপুণিকার দল লাস্যগতি, হাস্যময়ী ও অনন্তরহস্যসঙ্গিনী প্রণয়লীলারঙ্গিনী। সংসারের যে সৌন্দর্য এতদিন ধরা পড়ে নাই আজ তাই সহজ হ'য়ে চোখের আগে দেখা দিয়েছে। যৌবন তার গুণ টেনেছে তাই জীবন মনকে এমন জায়গায় নিয়ে ফেলেছে যেখানে বালক

মনের ফুর্তি আর নেই—কিন্তু আর একটি আনন্দলোকের সন্ধান আছে যার স্পর্শে শির উন্নত হয়ে ওঠে, দৃষ্টি সামর্থ্যে সতেজ হয়ে ওঠে, গণ্ড রক্তের আভায় তাজা হয়ে ওঠে—চিত্ত মন প্রাণ পূর্ণ হ'য়ে যায়—মনে হয় যেন আর কিছুরই অভাব নেই।

এ যৌবনের কথা তাই আজ চিত্তলোকে মর্ত্যলোকে এই অপূর্ব সঙ্গীত···অন্তরে বাহিরে এই আনন্দ-হিল্লোল। তাই আজ হতাশার কথা নয়—আজ অফুরন্ত আশার কথা অনন্ত দুরাশার কথা। তাই আজ মনে হয় এই যে সুন্দরী পৃথিবী এর আলো ছায়া হাসি অশ্রু সুখ দুঃখ জয় পরাজয় এ একান্ত আমারই। তাই মনে হয়, এই বজ্রমুষ্টিতে ধ'রে এ পৃথিবীর রূপ বদলে দেবার সামর্থ্য আমার এই চিত্তলোকে আছে। আজ সপ্তসাগরের তরঙ্গমালা মথিত ক'রে আমার অভিযান, অনন্ত আকাশের উধাও কল্পনায় আমার অভিসার। ধরিত্রীর ধূলিকণা আজ স্নেহ দিয়েছে, আকাশের তারার মালা আজ স্বপ্ন দিয়েছে। তাই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পেশীতে পেশীতে যে পুলক লাগে তা আজ এই শ্যামল ধরিত্রীর স্নেহাঞ্চলেই শেষ হয়ে যায় না। মর্ত্য আজ স্বর্গকে ভয় করে না। মর্ত্যের আকাঙ্ক্ষা আজ স্বর্গের সুষমাকে জয় করবার সামর্থ্য সঞ্চয় ক'রে মহীয়ান্ হয়ে উঠেছে।

এ যৌবনের কথা—এ জীবনের জয়গান। সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতি আজ কণ্ঠে বরমাল্য পরিয়ে দেবার জন্যে অপরূপ রূপসী সেজে মোহিনী হয়েছে। বলছে—এসো যৌবন ললাটে জয়টীকা নাও, কণ্ঠে বিজয়মাল্য ধারণ কর—তোমার ঐ অদম্য শক্তি অফুরন্ত সুষমা অক্লান্ত সঙ্গীতের সামর্থ্যে আজ মানুষকে জয়যুক্ত

কর। দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভয় দূরে যাক্। অনন্ত সাহসের মাঝে আজ সকল দৈন্য সকল ক্ষুদ্রতার লয় হোক্। সামর্থ্যের স্পর্শে লোভের পরাজয় হোক্—গতির গতিতে অকল্যাণ ভেসে যাক্—প্রাণের দ্যুতিতে অসুন্দরতা ঢাকা পড়ুক। আমার এই অনন্ত আকাশের নিবিড় নীলিমা যার আঁখির জ্যোতিতে জ্বল্ জ্বল্ তারই একটি দৃষ্টি-রশ্মি তোমার ঐ যৌবনের সুরে সুর লাগিয়েছে ভয় নেই, ভয় নেই, ভয় নেই।

(২)

এ বুড়া বয়সের কথা নয়—এ যৌবনের কথা।

এ যৌবনের কথা। তাই নারীর আবাহন আজ আমার কণ্ঠে জেগে উঠেছে। এসো নারি! আজ আমি তোমায় বরণ ক'রে নেব। কত কত পুরুষের যুগব্যাপী ধিক্কারের মাঝে শত শত ঋষির অভিশাপের মাঝখানে আজ আমি তোমাকে সাদর সম্ভাষণ করব। এসো নারি! আজ কাপুরুষের দুর্বলতা অজ্ঞানীর মূঢ়তা কেটে গিয়েছে। এসো শক্তিময়ি! আজ আমি তোমার শক্তি পরীক্ষায় প্রস্তুত।

এসো নারি! আজ আমার এ যৌবন-বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের সমীরণ-হিল্লোলে তোমার চরণ নূপুরের রুণু ঝুনু নিক্কনার বিভঙ্গ উচ্ছ্বাস বেজে উঠেছে। সে ঝঙ্কারে অমঙ্গলের চিহ্ন কোথায় দেবি! সে মঙ্গলময় নিক্কনার মাঝখানে ভগবানের সৃষ্টিকে আজ পূর্ণ ক'রে পেয়েছি, সে সঙ্গীতময় ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে জীবন দেবতার মন্দিরে আজ নূতন পূজার আয়োজন

আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছে, সে প্রেমময় গুঞ্জরণের স্পর্শে এ বিশ্বকে আজ সঙ্গীতময় করে তুলেছে। এসো দেবি! সঙ্গীতময়ীরূপে, প্রেমময়ীরূপে, কল্যাণময়ীরূপে।

নারি! আজীবন তোমাকে অনেক মূর্তিতে দেখেছি। কিন্তু আজ তোমার শ্রেষ্ঠ মূর্তিখানি—তোমার আসল স্বরূপ—আমার মানসনয়নে ফুটে উঠেছে। জননীর মূর্তিতে তোমাকে মঙ্গলময়ীরূপে দেখেছিলাম, ভগিনী মূর্তিতে তোমাকে স্নেহময়ীরূপে পেয়েছিলাম, কিন্তু আজিকার মূর্তি তোমার সঙ্গীতময়। প্রতি পাদক্ষেপে তোমার সঙ্গীতের ঝঙ্কার, অঙ্গের প্রত্যেক সঞ্চলনটি তোমার সঙ্গীতমাখা, গ্রীবার প্রত্যেক হেলনটি, আঁখি তারকার প্রত্যেক দৃষ্টিখানি আজ তোমার সঙ্গীতময়। সঙ্গীতময়ি! তোমার স্পর্শ আজ আমার হৃদয়কে সঙ্গীতময় ক'রে তুলেছে। এসো নারি। আজ আমি তোমায় সাদর সপ্রেম সম্ভাষণ করছি।

শৈশবে নারি! তোমার মাতৃমূর্তিটি আমার হৃদয়ের দ্বারে আমার সুখের সংবাদ নেবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকত, কৈশোরে তোমার স্নেহময় ভগিনী মূর্তিটি আমার হৃদয়ের বাতায়নে বাতায়নে আমার দুঃখের কাহিনীকে স্নেহের প্রলেপে শীতল ক'রে তুলত—কিন্তু আজ এ যৌবনে নারি! তোমার মহীয়ান্ গরীয়ান্ মহিমাময় মূর্তিখানির জন্যে আসন পেতেছি আমার মরমের একান্ত অন্তরে। তোমার সঙ্গে যাতে আমার সমস্ত দূরত্ব দূরীভূত হয় তার জন্য আজ সেখানে আয়োজন করেছি—যেখানে সুখ দুঃখের ব্যবধান থাকবে না—যেখানে দুইটি দেহে

একটি অন্তর কম্পিত হবে, দুইটি প্রাণে একটি রাগিণী ঝঙ্কৃত হবে, দুইটি জীবন একটি ইষ্টে ধাবিত হবে। যেখানে দুইটি প্রাণের সঙ্গীতের সুরের জাল আজ সমস্ত ব্যবধানকে মিথ্যা ক'রে দেবে।

এসো নারি! আজ তুমি তোমার চরণ-নূপুরের রুণু ঝুনু নিক্কনার বিভঙ্গ উচ্ছ্বাস তুলে মরাল বিনিন্দিত মন্থর গতিতে আমার সম্মুখে উদয় হও। এসো নারি! আজ তোমার নিবিড়কৃষ্ণ আঁখিদ্বয়ে কৃষ্ণ কজ্জল লিপ্ত ক'রে দাও, তোমার হৃদয়ভাগে স্বর্ণ হার দুলিয়ে দাও, কর্ণে কর্ণালঙ্কার জ্বল্ জ্বল্ করতে থাকুক—আর তোমার মোহন গ্রীবায় মোহনতর ভঙ্গিমা তু'লে তোমার আখিজলধর হ'তে বিদ্যুৎ বর্ষণ করতে থাক—দেখ আমাকে ভস্মীভূত করতে পার কি না। না—সে বিদ্যুতের আলোকে আমার হৃদয়-কন্দর আলোকিত হ'য়ে উঠবে—সে আলোকে অন্তরে আনন্দের ফোয়ারা ছুটবে—সে আনন্দের ফোয়ারায় এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সঙ্গীতময় হ'য়ে উঠবে। ভস্মীভূত হব? হায় নারি! তোমার ঐ বিদ্যুৎপরিপূর্ণ আঁখিতারকার দৃষ্টিই যে আমার শক্তি, আমার প্রাণ, আমার দীপালি। ভস্মী-ভূত হব? হায় নারি! বুঝ্‌বে? তুমি যে কাব্য, আমি কবি, তুমি আলেখ্য আমি চিত্রকর, তুমি সঙ্গীত, আমি গায়ক। তুমি আছ তাই নব বসন্তে আম্র বনে বনে ফুল্ল মুকুলের মিষ্ট গন্ধে দূর দূরান্তের স্বপ্ন জেগে উঠে—তাই বাসন্তী পূর্ণিমার মেঘলেশহীন উদার আকাশতলে চন্দ্র এমন ক'রে জ্যোৎস্না প্লাবনে প্লাবিত করে—তাই মধু আহরণে ব্যস্ত অলির গুঞ্জনে

দক্ষিণা বাতাসের মধুময় স্পন্দনে এমন ব্যথিত বিরহের মধুময় বেদনা দিকে দিকে চারিয়ে যায়! নারি! তুমি আছ তাই এ নব যৌবনের নবীন ফাল্গুনের সহস্র সুর সহস্র রঙ্গিমা দিয়ে আমার চিত্ততল বিলাসী হ'য়ে উঠেছে—তুমি আছ তাই নব বর্ষার মেঘমেদুর অম্বরতলে দূরশ্রুত দাদুরী ডাকের সাথে সাথে যেন কোন্ আদিম কাল হ'তে কার মধুময় অপেক্ষার সুখে মর্মতল সুখান্বিত হ'য়ে ওঠে—তুমি আছ তাই বিজন গৃহের সান্ধ্য প্রদীপের রশ্মিধারায় যেন সপ্তস্বরার মধুময় ঝঙ্কার বেজে যায়। তুমি আছ তাই আমার আঁখি তারকায় কি এক অঞ্জন স্পর্শে চারিদিক মোহন হ'য়ে আমার চোখে ধরা পড়েছে।

এসো নারি! আজ তোমারি প্রণয়ে আমার হৃদয় প্রেমময় হ'য়ে উঠেছে। আজ বুঝলাম হৃদয়ের সহিত হৃদয় মিলান কি সুখ। পরের জন্য বেঁচে থাকায় কি আনন্দ, তার সন্দেহ লেশহীন আভাস আজ পেয়েছি। এসো অন্তরলক্ষ্মী লক্ষ্মীরূপে; এসো দেবানুগৃহীতা দেবাশীর্বাদ নিয়ে, এসো হাস্যময়ী চতুর্দিকে তোমার লাবণি বিচ্ছুরিত ক'রে দিয়ে। তোমার আভাসে আমার নিঃস্ব গেহ মঙ্গলময় আনন্দময় ও সুখময় হ'য়ে উঠবে।

এসো নারি! কোথায় তোমার প্রথম সন্ধান পেয়েছি বলতে পারি নে। কিন্তু দিকে দিকে তোমার ইন্দ্রজাল আজ বিছিয়ে গেল। ঐ যে প্রভাত সমীরণ স্পর্শে লক্ষ লক্ষ ফুল ফুটে ওঠে তাদের মর্মতল থেকে যেন তোমারি অধরের মৃদু হাস্য উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে—আকাশের মেঘ পুঞ্জে পুঞ্জে তোমার

সুদীর্ঘ কুন্তল জালের নিবিড় কালিমা উজ্জ্বল হ'য়ে ধরা পড়েছে—তোমার দেহের সুরভিতে সুরভিতে আকাশ বাতাস মত্ত—তোমার কাব্য আজ চারিদিকে সঙ্গীতের সুর ঢেলে দিয়েছে। কোথায় তোমার প্রথম সন্ধান পেয়েছি বলতে পারি নে। কিন্তু দিকে দিকে আজ তোমার সত্তা বিছিয়ে গেল—অপরাজেয় অপ্রমেয়, অরিন্দম।

কোথায় তোমার প্রথম সন্ধান পেয়েছি বল্‌তে পারি নে। বিশ্বমানব কবে তোমার প্রথম সন্ধান পেয়েছিল তাঁর স্মৃতির সন্ধান আজ কেউ দিতে পারে না। তুমি কি সেই, মন্থিত সাগর হ'তে অমৃত পিয়াসী সুরাসুরের মাঝখানে মোহিনীরূপে উদিত হয়েছিলে! তুমি কি সেই, সুরসভাতলে নৃত্যচঞ্চলা ঊর্বশীরূপে পারিজাত পুষ্পের নিবিড় সুরভি ও সুষমা নিয়ে উচ্ছ্বসিত পুলকে ফুটে উঠেছিলে—শুভ্রকান্তি দিগ্‌বসনা অকুণ্ঠিতা অনিন্দিতা! তুমি কি সেই, কোন্ আদিম বসন্ত-প্রাতে কম্প্রবক্ষে নম্রনেত্রপাতে কোন্ তরুণবিরহীর বিরহতাপিত বক্ষ তোমার তনুর তনিমা দিয়ে আবৃত ক'রে দিয়েছিলে, তার তৃষিত ওষ্ঠাধরে তোমার লঘুভার করপদ্মে ধৃত অমৃতভাণ্ড তুলে ধরেছিলে, তার মানসলোকের কুহকে তোমার বক্ষপুটের শ্বাস সঞ্চারিত করে' শরীরী করে তুলেছিলে! তুমি কি সেই অনন্ত-যৌবনা, আদ্যন্ত-বিহীনা, স্বপ্নসঙ্গিনী লীলারঙ্গিনী! কোথায় তোমার প্রথম সন্ধান পেয়েছি বলতে পারি নে—কেউ বলতে পারে না।

কিন্তু আজি এ যৌবনের গীতে হে উর্ব্বশি! হে প্রেয়সি!

হে শ্রেয়সি! হে অনবগুণ্ঠিতে! তোমার যৌবন-চঞ্চল মদির গন্ধে জীবন-কমল বিকশিত কর, আলোকিত কর, পুলকিত কর—যৌবন-বিশ্ব গেয়ে উঠুক—তোমার জয় জয় জয় হে!

———

প্রিয়ে শোন শোন

—প্রিয়ে, শোন শোন।

প্রস্থানোদ্যত প্রিয়া ফিরে দাঁড়ালেন, বললেন—কি?

আমি সুর ক'রে ধরলেম—"সখি কি পুছসি অনুভব মোয়"—

প্রিয়া চাবির গোছায় মৃদু ঝঙ্কার তুলে বললেন—"তোমার গান শোনবার এখন আমার সময় নেই।"

আমি গাইলেম—"সেহ পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নূতন হোয়।"

আমাকে নাছোড়বান্দা দেখে প্রিয়া তাঁর আঁচলে-বাঁধা চাবির গোছাটা কাঁধের উপর দিয়ে পিঠের দিকে ফেলে দিয়ে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানেই মেঝেতে বসে' পড়লেন। এমন গানের এমন শ্রোতা পেয়ে আমার উৎসাহের ধারা নায়গ্রা

জলপ্রপাতের মতো সহস্রমুখী হয়ে ঝরতে লাগল। আমি গানটি আদ্যোপান্ত গাইলেম—

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেহ পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সেহ মধুর বোল শ্রবনহি শুনলু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়িনু
না বুঝনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি॥
কত বিদগধ জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক॥

আমার গানের সুরের শেষ ঝঙ্কার না মিলাতে মিলাতে প্রিয়া উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—"জান, ঘরে চাল বাড়ন্ত, কোথাও থেকে চারটি চাল জোগাড় ক'রে আনতে না পারলে আজ আর রান্না চড়বে না,—তোমার আফিসে যেতে হবে না খেয়ে।" তারপর প্রিয়া তাঁর ললিত লবঙ্গলতিকার ন্যায় দেহলতাকে কঠিন ক'রে তাঁর চতুর্বিংশতি বর্ষের স্থিরযৌবনের

আভা গুটিয়ে নিয়ে প্রতিবেশীর গৃহাভিমুখে চ'লে গেলেন। হায় প্রিয়া!

আজ এই নববর্ষার প্রভাতে যখন মেঘেরা তাদের কপিশ নিবিড় জটা ছুলিয়ে দিয়ে সারা আকাশকে অশ্রুভারাক্রান্ত করেছে; কদম কেয়া তাদের মৃদু গন্ধ বিছিয়ে জলধারাকে আমন্ত্রণ পাঠিয়েছে—"এস হে এস সজল ঘন বাদল বরিষণে"; যখন বিরহী কান্তকান্তার চিত্ত-বিলাপ সহজ হ'য়ে উঠেছে; বুঝি কত কত গিরিগুহায় যক্ষ-হৃদয় উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছে; কত বনে বনে কলাপী তার বর্হ মেলে দিয়ে নৃত্য সুরু করেছে; —তখন তোমার ঐ ললিত লবঙ্গলতিকার ন্যায় দেহলতার মধ্যে যে একটি মন আছে, ওই স্থিরযৌবনশ্রীর অন্তরে যে একটি প্রাণ আছে, সেই মন সেই প্রাণের কাছে কি না "ঘরে চাল বাড়ন্ত" এই কথাটাই সবার চাইতে প্রধান হ'য়ে রইল! এর চাইতে নৃশংসতা আর কি আছে? আজ দু'দণ্ড কি প্রতিদিনকার হিসেবগুলো, আফিসের খাতাপত্রগুলো বিস্মৃতির কালো পর্দা ঢাকা দিয়ে, চিত্ততলে এই কথাটাকে প্রধান ক'রে তোলা যায় না—

সখি! কি পুছসি অনুভব মোয়—

আজ এই আসন্ন বর্ষার মেঘমেদুর অম্বরতলে যখন চারিদিকে ঘোর ঘোর হয়ে এসেছে, চিত্ততলে কোন্ প্রদীপ জ্ব'লে উঠেছে, মানসলোকের রঙীণ স্বপ্নের জালের সূক্ষ্ম তন্তুরাজি কোন্ দূর-দূরান্তরে বিছিয়ে গেছে;—তখন মর্মতলে এই অনুভবটাই যে সবার আগে সবার চাইতে আনন্দ ও ব্যথা নিয়ে জেগে উঠেছে,

—"সখি কি পুছসি অনুভব মোয়"! এই অনুভবের মধ্যে চাওয়া পাওয়ার কোন দাবী সেই, লাভ লোকসানের কোন হিসেব নেই, অতীত ভবিষ্যতের কোন অনুসন্ধান নেই। এ অনুভব স্বরাট অহৈতুকী—এর সুখ পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের গুরু গুরু ডাকের তালে তালেই, এর বেদনা কদম কেয়ার বিচ্ছুরিত গন্ধের সাথে সাথেই; মানুষের সকল সুখদুঃখের অনুভবের সার্থকতা সেই অনুভবের মধ্যেই—তার বাইরে নয়। মানুষের জীবন থেকে যদি অনুভবগুলো উঠিয়ে দেওয়া যায়, তবে তার জীবনের আর কি থাকে?

এই অনুভব!—মানবমানবীর অনুভবসামর্থ্যের মধ্যেই যে তাদের জীবনের সকল রহস্যের বাসস্থান। পশু মানুষ, কবি অকবি, কর্মী জ্ঞানী, দেবতা দানব, প্রণয়বান প্রেমহীন, বীর কাপুরুষ, এদের মধ্যে প্রভেদ তো কেবল ঐ অনুভব সামর্থ্যের। কাব্যে নানা সুর, দর্শনে নানা মত, জীবনে নানা ভঙ্গিমা; এর পিছনে আছে কেবল অনুভব বৈষম্য। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই একটা বিরাট অনুভব-সমষ্টি—আর কিছু নয়।

মানুষের সভ্যতার ইতিহাস এই অনুভবসমষ্টির ইতিহাস। গ্রীস্, রোম, বাবিলন, মিশর, ভারতবর্ষ, চীন, এদের সভ্যতার নিরিখ আমরা সেইখানে সেইখানে খুঁজি, যেখানে যেখানে পাই এদের অনুভবের চিহ্ন অঙ্কিত। এদের কাব্য, এদের সাহিত্য, এদের ভাস্কর্য চিত্রকলা, এদের দর্শন, পুরাণ, যার যার পিছনে এদের অনুভূতির মহিমা চির উজ্জ্বল হ'য়ে আছে—যে যে বস্তুকে আশ্রয় ক'রে এদের অন্তরলোকের সাধনা আনন্দলোকের

স্পর্শলাভ ঘোষণা করেছে—সেইখান দিয়ে ব'য়ে এসেছে এদের ইতিহাসের ধারা। জার্মান জাতির ইতিহাসে তার বিশ্ব-বিজয় আকাঙ্ক্ষা একটা ঘটনামাত্র, কিন্তু তার গ্যেটে হাইনে, তার নিট্‌শে সোপেনহার, তার বিটোফেন ওয়াগ্‌নার তার লাভের ঘরে আসল অঙ্কপাত। এইখানেই বিশ্ব জার্মানির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এইখানেই বিশ্বমানব-সভ্যতার ধারায় জার্মানি আপনার সব দান অর্পণ করেছে। জার্মানির বিশ্ব-বিজয়-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বিশ্বের সম্বন্ধ নাস্তিমূলক। কিন্তু তার অন্তরানুভূতির সাধনা যেখানে, সেখানে সারা বিশ্ব সাগ্রহে এসে মিলেছে—বলেছে জার্মানি বিশ্বশৃঙ্খলার একটি নিয়ম, তার অনুভবের ধারা বিশ্ব-মানবের অনুভূতির একটি তরঙ্গ; তার কাব্য, দর্শন, সঙ্গীত, বিজ্ঞান আমাদের আনন্দ দিয়েছে, মৃত্যু দেয় নি। এইখানেই বিশ্বের শুভেচ্ছা জার্মানি লাভ করেছে, আর জার্মানির আত্মার আনন্দ-স্পর্শ বিশ্ব অনুভব করেছে। সত্য ও মঙ্গল এইখানে আপনার আসন পেয়েছে। ক্রুপের কারখানার হাতুড়ির ঠক্ ঠক্ পটস্‌ডামের যুদ্ধদামামা, আর্টিলার রণ-হুঙ্কারের চাইতে কিছুমাত্র সুশ্রাব্য নয়। কিন্তু বিটোফেনের সঙ্গীতরাগ সভ্য জগতকে যে বন্ধনে জার্মানির সঙ্গে বেঁধেছে, তা' ছিন্ন করবার ক্ষমতা সভ্য মানুষের হাতে নেই। প্রবুদ্ধ জার্মানি আমাদের আত্মীয়, প্রযুদ্ধ জার্মানি নয়।

মানুষের শিক্ষাদীক্ষা, আধ্যাত্মিক সাধনা সমস্ত তার এই অনুভব সামর্থ্যের উৎকর্ষতার আয়োজন। এই অনুভবসামর্থ্যের উৎকর্ষতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অর্জিত আনন্দের রূপ নিবিড়

থেকে নিবিড়তর হ'তে থাকে। সাধারণ মানুষের থেকে কবির একটা বিশেষ অনুভব সামর্থ্য আছে। এই বিশেষ অনুভব-সামর্থ্যই তার চোখে একটা বিশেষ দৃষ্টির সৃষ্টি করেছে। তাই বিশ্বপ্রকৃতির কাছ থেকে, শিশুর হাসি থেকে, কিশোরীর যৌবনশ্রী থেকে যে আনন্দ আহরণ ক'রে সে নেয় তার নিশানা সাধারণ মানুষ কোথায়ও খুঁজে পায় না। শরৎ ঊষার আকাশে কি আছে,—যা' সাধারণ মানুষের চোখে পড়ে না? বর্ষার মেঘের গুরু গুরু ডাকে কি আছে, যা সাধারণ মানুষের কানে লাগে না? বসন্তের স্পর্শে, আম্রমুকুলের সৌরভে, সামান্য অলিকুলের পক্ষতাড়নে কি আছে, যার নিরিখ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছোয় না? কিশোরীর গ্রীবাভঙ্গীতে এমন কি আছে যা' কবিচিত্তে আকাঙ্ক্ষার মত্ত আবিলতাকে সহজে ছাপিয়ে ওঠে? কিন্তু প্রাকৃত মানুষ তার সন্ধান পায় না। তাই প্রাকৃত মানুষ বলে—কবি, তুমি যা' দেখছ তার প্রকৃত অস্তিত্ব কোথাও নেই, এক তোমার উর্বর কল্পনায় ছাড়া। কবি হেসে উত্তর দেয়—আমি যা' দেখছি সেইটেই বিশেষ ক'রে বাস্তব। এ বাস্তবতাকে দেখবার দৃষ্টি তোমার নেই, কারণ তোমার অন্তরলোক এই বিশেষ অনুভবের স্তরে পৌঁছোয় নি। তাই বিশ্ব প্রকৃতি তোমার কাছে মূক, বিশ্ব-মানব প্রাকৃত জীবনের সহজ আকাঙ্ক্ষার সমষ্টিমাত্র, বিশ্বসংসার একটা সনাতন চক্রের আবর্ত্তন। তাই তোমার জীবনের পাত কেবল জমাখরচের ছোট বড় নানা অঙ্কে ভ'রে উঠল; কিন্তু সেখানে সেই রাগিণীর সুর একটিও নেমে এল না, যা' জীবনকে জীবনাতিরিক্ত করে'

তোলে, দৈনন্দিন আকাঙ্ক্ষার শাসন নত ক'রে' দেয় মানুষ যেখানে পুলকবিহ্বল হ'য়ে বলে—"কি পুছসি অনুভব মোয়।" সাধারণ মানুষ অবিশ্বাসের সুরে বলে—ছোঃ, বিকৃত মস্তিষ্কের স্বপ্ন, গঞ্জিকাসেবীর প্রলাপ! অনুভবসামর্থ্যের অভাবে বৃহত্তর আনন্দের অবদান এখানে মিথ্যা হ'য়ে আছে।

কিন্তু তবুও আমাদের প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার অতিরিক্ত অনুভবের এই প্রভাবকে আমরা এড়িয়ে চল্‌তে পারি নে। তাই শিল্পের এবং শিল্পীর, কাব্যের এবং কবির, চিত্রের এবং চিত্রকরের আসন আমরা উঁচুতে স্থাপন করেছি। এরা যে আমাদের মুক্তি দেয় আমাদের প্রতিদিনের আকাঙ্ক্ষার প্রয়োজন থেকে, আমাদের মনের নানা তর্কবিতর্ক থেকে, আমাদের বুদ্ধির নানা প্রশ্ন নানা সন্দেহ থেকে। শিল্পী কবি আমাদের চোখের সামনে, মনের সামনে যা ধরে, সে যে একটা অনুভবের সুষমাগঠিত সাকার মূর্তি। তাকে অবিশ্বাসের চোখে দেখতে পারি, কিন্তু অস্বীকার করবার উপায় নেই। সে যে আপন মহিমাতেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের হিসেবের খাতার অঙ্কগুলোকে ছাপিয়ে ওঠে, বলে—দেখ আমি কোন্ দিব্যলোক থেকে নেমে এসেছি সহজ সুষমায়, স্বতঃউচ্ছ্বসিত সঙ্গীতে, লীলায়িত রেখায় ছন্দে বর্ণে গন্ধে; এই সহজসুন্দরকে ঠেকিয়ে রাখ্‌বে কি দিয়ে?—তোমার ঐ জীবন-যাত্রার কোলাহল দিয়ে? তোমার ঐ দৈনন্দিন কাড়াকাড়ির সংগ্রাম দিয়ে? তোমার ঐ বিশ্বগ্রাসী জড় বস্তুর ক্ষুধা দিয়ে?—সুন্দরকে তোমার বুদ্ধি মন প্রাণ অবিশ্বাস করতে পারে, কিন্তু

তোমার অন্তরাত্মা যে জানাবেই আমি নেমে এসেছি জীবনের বৃহত্তর আনন্দের অবদান সঙ্গে নিয়ে। আমার পিছনে আছে সেই বস্তু যা অনির্বচনীয়, যা প্রশ্নের অতীত, সুতরাং তা'তে সন্দেহের অবসরই নেই ; যা ব্যাখ্যার বাইরে, সুতরাং তা'তে প্রমাণ অপ্রমাণের স্থানই নেই ; যা একমাত্র অনুভবগম্য। ভগবদ্-ভক্তিই হোক্ ব্রহ্মানন্দই হোক্, সব এই অনুভবেরই এক এক প্রকারভেদ।

এই অনুভব সাধনা মানবজাতির কেন্দ্রগত গোপন রহস্য বলে' আমাদের জীবনে তথ্যের চাইতে তত্ত্ব, ব্যাকরণের চাইতে কাব্য, ইতিহাসের চাইতে রূপকথা, রয়টারের তারের খবরের চাইতে উপন্যাস বড়। কারণ, তথ্য, ব্যাকরণ, ইতিহাস, তারের খবর কতকগুলো ঘটনাসমষ্টি মাত্র, যে ঘটনাগুলো ঘটে' যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে। ওর সঙ্গে আমাদের যে যোগ, সে হচ্ছে কানের ও মনের। এর মধ্যে সেই রস নেই, যে রস আমাদের অন্তরাত্মাকে সঞ্জীবিত করে, বৃহৎ করে, আমাদের অনুভবের রাজ্যে বুদ্ধির টানা কঠিন সীমা রেখাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, আমাদের গভীরতম আমিকে মুক্তি দেয়। কিন্তু কাব্যে ও উপন্যাসে, তত্ত্বে ও রূপকথায় আছে একটি অন্তরাত্মার সেই অনুভব, যার সীমারেখা আমাদের মনের মন্দিরে এসেই ঠেকে থাকে না, যার সঙ্গে আমাদের অন্তরাত্মার কোন ব্যবধানই নেই। তাই এর স্পর্শে আমরা বলি—পেয়েছি সেই বস্তু, যা' আমার জীবনে বিশেষ করে' প্রয়োজন ; যে বস্তু ইতিহাসের আলোচনায়, ব্যাকরণ-সূত্রের

গবেষণায়, রাশি রাশি তথ্যের বোঝার মাঝে খুঁজে পাই নি। আজ একটি অন্তরের অনুভূত আনন্দ আমার অন্তরকেও আনন্দাপ্লুত কর্‌ল; একটি অন্তরাত্মার উচ্ছ্বসিত রস-ধারা আমার অন্তরাত্মাকে রসে অবগাহিত কর্‌ল। তখন আর আমরা তর্ক করি নে, ব্যাখ্যা কর্‌তে বসি নে, প্রমাণ চাই নে। তখন পুলকবিহ্বল হয়ে শুধু বলি—"কি পুছসি অনুভব মোয়"।

এই অনুভব-সাধনা মানব-জাতির কেন্দ্রগত গোপন রহস্য বলে' শাস্ত্রবাক্যের চাইতে মানুষের জীবন-কাব্য বড় হ'য়ে রইল। মানুষ জীবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতি পাদক্ষেপটি কি করে ফেলবে, শাস্ত্রবাক্য তারই বিধি কঠিন করে' বসে' আছে। কিন্তু জীবন-কাব্য হঠাৎ একদিন নবীন উষায় পুলক-কম্পিত কণ্ঠে বলে' ওঠে—আমি নতুন পথের অনুভব পেয়েছি—নতুন পথের নবীন রাগিণী আমাকে ডাক দিয়েছে, আমার অন্তরাত্মা স্পর্শ করেছে, সেই স্পর্শ আমাদের সঞ্জীবিত করছে, আনন্দাপ্লুত করছে। ওই পথেই আমাকে চল্‌তে হবে, কারণ ওইখানেই আমার জীবনের অনুভব সত্য হ'য়ে উঠেছে, ওইখানেই আমি সত্য হ'য়ে উঠ্‌ছি। ও পথে কি আছে জানি নে। হয়ত সুখ আছে, দুঃখ আছে, হাসি আছে, আছে অশ্রু, আঘাত আছে, আশীর্বাদ আছে, জয় আছে, পরাজয় আছে—ওখানে নির্বিঘ্নতা নেই, নিশ্চিন্ততা নেই, প্রতিদিনের পরিচিত সহজ গতিভঙ্গী নেই; কিন্তু ওই সুখদুঃখে, হাসিঅশ্রুতে, আঘাতআশীর্বাদে আছে জীবনের উচ্ছ্বসিত রসধারা, যা আমার সঞ্জীবনী সুধা। ওর ছন্দ ও সুর, বর্ণ ও গন্ধ আমার কাঠিন্য দূর ক'রে আমাকে

লীলায়িত করবে, অভ্যাস-চক্র থেকে মুক্তি দিয়ে আমার মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তুল্‌বে, আমার সামর্থ্যকে সাকার ক'রে তুল্‌বে ; তাই শাস্ত্রের অনুশাসন আমার মান্‌বার উপায় নেই। শাস্ত্র-বাক্য সেখানে সমাপ্তি টেনে শেষ হয়ে থাকে, মানুষের অনুভব সেখানে আবার নবীন আরম্ভের সুর তুলে নব যাত্রার আয়োজনে জীবনের অন্তরবাহির গতিশীলতার লক্ষ্মীশ্রীতে পূর্ণ করে' তোলে, বৃহৎ করে' তোলে, স্বরাট করে' তোলে যুগে যুগে লোকে লোকে।

তাই এই অনুভব-রাজ্যের স্বর্ণ-দুয়ার যাদের পক্ষে রুদ্ধ হয়ে গেছে, জীবনে বেদনা ও আনন্দের স্পর্শকেও তারা হারিয়েছে। অভ্যাসের চক্রে তারা যত ঘুর্‌তে থাকে, অমৃতত্বের কাছ থেকে তারা তত দূরে সরে যায়। এই অভ্যাসের চক্র তাদের কেবলই খর্ব করতে থাকে। তাদের আত্মাকে খর্ব করে, তাদের মনকে প্রাণকে বুদ্ধিকে খর্ব করে। তাদের সমাজকে, আশা আকাঙ্ক্ষাকে, কর্মানুষ্ঠানকে, তাদের আত্মশক্তিকে খর্ব করে। মৃত্যুকে তারা আর কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারে না।

কিন্তু বল্‌ছিলেম আমার প্রিয়ার কথা। "সখি কি পুছসি অনুভব মোয়"—বৈষ্ণব সাহিত্যের এই অতুলনীয় গানটির উত্তরে প্রিয়ার "ঘরে চাল বাড়ন্ত" এই বাক্যের বিসদৃশতার কথা। হায় প্রিয়া!

তবে এ কথা মানি যে মানব-জাতির আহার করবার একটা বিধি আছে। অন্ন যে ব্রহ্ম—এটা সেকালের কথা হলেও,

একালেও এ সত্য কিছুমাত্র মলিনতাপ্রাপ্ত হয় নি। বরং এই কলিকালে এ সত্য অতিরিক্ত উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। এবং ঐটেই আপত্তি। ওই অতিরিক্ত উজ্জ্বলতা।

অন্ন ব্রহ্ম—মানুষের জীবনে এ সত্যের বিধি-নির্দিষ্ট একটা স্থান আছেই। কিন্তু এ সত্য যদি সেই স্থানকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে মানুষের জীবন-কাব্যের সকল পৃষ্ঠাগুলিকেই অধিকার করে' বসে, যদি পুরুভুজের মতো ভুজ মেলে দিয়ে মানুষের মন প্রাণ বুদ্ধি আত্মাকে জড়িয়ে আপনার বেষ্টনীর মধ্যে কেবলই পিষ্ট কর্‌তে থাকে, তবে কোথায় থাকবে মানুষের জীবনে বৃহত্তর আনন্দের আয়োজন ? কোথায় থাক্‌বে তার কণ্ঠে সেই রাগিণী, যা' তারার সুরে সুর মেলায়, মেঘের ডাকে ডাকে রূপ পায় ? এই রাগিণীই না সারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে মানুষের সহজ আত্মীয়তা স্থাপন করেছে ? এই রাগিণীই না প্রতি মুহূর্তের সমাপ্তির ভিতরে প্রতি মুহূর্তের আরম্ভের জন্ম দিয়েছে ? এই রাগিণীই না মানুষকে প্রতি নিমেষে বল্‌ছে—মানুষ, তোমার শেষ তোমাতে নয়—তোমাকে অতিক্রম করে' ? এই রাগিণীতেই না মানুষ প্রতি নিমেষে আপনাকে অতিক্রম করে' করে' চলেছে ? অন্নের অত্যাচারের নীচে যদি এই রাগিণী চাপা পড়ে' যায়, তবে বিশ্ব-মানব কেবলমাত্র বৈশ্যমনের আধার হয়ে উঠবে। তখন আর বর্ষার জলধারা, বসন্তের নবকিশলয়, জ্যোৎস্নার সঙ্গীত, সন্ধ্যার রাগিণী মানুষকে সেই বস্তু দিতে পার্‌বে না, যে বস্তু তার অন্তরকে সুন্দর করে, আনন্দাপ্লুত করে, তাকে অতিরিক্ত করে।

তখন আর মানুষ দেবতার সিংহাসনের দিকে হাত বাড়াবে না, তখন সে আপনার মাঝেই আপনি নিঃশেষ হয়ে থাক্‌বে।

প্রতি মানুষের মধ্যেই একটি কবি আছে। অন্নের অত্যাচার যদি এই কবিকে নত করে, তবে আর কোন নবযৌবনা প্রেয়সীর রূপরাশিই আঁধার ঘরে আলো জ্বালবে না; তার আঁখির আলো আনন্দ-তরঙ্গ তুল্‌বে না; তার ঠোঁটের হাসি, গ্রীবার ভঙ্গী, তার দেহের রেখা, ছন্দ, সুর কোন স্বপ্ন-লোকেরই সৃষ্টি কর্‌বে না। তখন পুরুষ নারী দুইই জীবনের সেই এক পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে—যার পাওনা দৈনদিন জীবনযাত্রার হিসেবের খাতা খুঁজে কোথায়ও মিল্‌বে না।

অতএব অয়ি প্রিয়ে! অয়ি দীর্ঘ-কুঞ্চিত-কুন্তলে! অয়ি দুগ্ধ-চম্পক-বর্ণ-সন্নিভে! অয়ি চাবিগুচ্ছবদ্ধ অঞ্চলে! এসো—আজ আর কিছু নয়। এসো—আজ এই নববর্ষার প্রভাতে যখন মেঘেরা তাদের কপিশ নিবিড় জটা দুলিয়ে দিয়ে সারা আকাশকে অশ্রুভারাক্রান্ত করেছে; কদম কেয়া তাদের মৃদুগন্ধ বিছিয়ে জলধারাকে আমন্ত্রণ পাঠিয়েছে—"এস হে এস সজল ঘন বাদল বরিষণে";—যখন বিরহী কান্তকান্তার চিত্ত-বিলাপ সহজ হ'য়ে উঠেছে; বনে বনে কলাপী তার বর্হ মেলে দিয়ে নৃত্য সুরু করেছে; তখন এসো—আমরা কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে একসঙ্গে ওই গীত গাই—

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেহ পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥

আমি একা

আমি একা। দ্বিপ্রহর রজনী ও আমি একা।

সান্দ্র জ্যোৎস্না ভুবন ছেয়ে হেসে উঠ্‌ল। গভীর নিবিড় নীরবতা সমস্ত কোলাহল ডুবিয়ে ধ্যানসমাহিত। সুপ্ত নগর, সুপ্তা নগরী। গৃহে গৃহে নাগরিক সুপ্ত। অট্টালিকায় ধনী সুপ্ত। রাজপ্রাসাদে নৃপতি সুপ্ত। দেবালয়ে দেবতা সুপ্ত। আকাশ বাতাস আর পক্ষীকূজনে মুখরিত হয় না—তারা সুপ্ত। শুধু সুপ্ত নই একা আমি।

যদি সবাই সুপ্ত হবে তবে এই রজনী ভোগ কর্‌বে কে? এই যামিনী—সান্দ্র জ্যোৎস্না পরিপ্লাবিত ভুবনমোহিনী যামিনী, গভীর স্তব্ধতাধ্যুষিত যোগীজনবাঞ্ছিত যামিনী—এই যামিনী ভোগ কর্‌বে কে? যদি কেউ ভোগ না করবে তবে ভগবান এই নিরানন্দ উৎসারিণী আনন্দ-বর্ধিনী যামিনীর সৃষ্টি কেন করলেন? তবে ঐ চন্দ্রের সৃষ্টি কেন? ওর ঐ মনোমোহিনী শান্তোজ্জ্বল আবেশবিহ্বল জ্যোৎস্না কেন? রজনী সর্বদা অন্ধকারসমাচ্ছন্না হল না কেন? ঈশ্বর পদার্থ সৃষ্টি করেছেন ভোগের জন্য; আর সেই সব ভোগ করবার জন্য সৃষ্টি করেছেন মানুষ ও তার একাদশ ইন্দ্রিয়। মানুষ ভোগী আর সব ভোগ্য। তাই এই জ্যোৎস্নাপরিপ্লাবিত প্রসন্নতা-পরিপূরিত বাঞ্ছিত রজনীতে আমি জাগ্রত ও আমি একা।

আমি জাগ্রত।

আমি জাগ্রতই ত থাক্‌তে চাই। আমি ত নিদ্রা যেতে

চাই না। হে জগদীশ সর্বশক্তিমান আমাকে চিরকাল জাগ্রত রেখো। আমি অজ্ঞানান্ধকারে, তাতে আসে যায় না কিন্তু আমাকে জাগ্রত রেখো। আমাকে জাগ্রত রেখো যেন এই নিবিড় ঘন অন্ধকারে জ্ঞানালোকের সূক্ষ্ম রশ্মিকণা আমার দ্বারে এসে ফিরে না যায়। আমাকে জাগ্রত রেখো যখন বাঞ্ছিত এসে আমার হৃদয়ের দ্বারে দাঁড়াবে তখন যেন তার সমাদর কর্‌তে পারি। হে অন্তর্যামী, হে অন্তর দেবতা, আমাকে জাগ্রত রেখো যখন নিবিড় তমসার রাশি ভেদ করে' প্রথম ঊষার ক্ষীণ স্নীগ্ধ আলোকের উন্মেষ ধীর ধীরে হবে তখন যেন শত সহস্র বিহগের কলকণ্ঠ ঝঙ্কার আমার হৃদয়ে রাজে। তাই আমি ঘুমুতে চাই না! যখন ভীষণা প্রকৃতি আপনার সমস্ত শক্তি নিয়ে প্রবল ঘূর্ণ্যমান বাত্যা সঙ্গে প্রলয়ের রণচণ্ডী-মূর্তিতে দিকে দিকে বিদ্যুৎ ঝলকে বিশ্বের তমসার রাশিকে গাঢ়তর, গাঢ়তর, গাঢ়তর করতে থাক্‌বে তখন যেন সুপ্তি এসে আমার নয়নদ্বয় অধিকার না করে। আবার যখন শান্তা প্রকৃতি মৃদু বাতান্দোলিত হৃদয়ে সহাস্য মুখে আকাশে বাতাসে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে প্রসন্নতা বিতরণ কর্‌তে থাক্‌বে তখনও যেন আমি ঘুমিয়ে না পড়ি। মার্কণ্ডেয়ের মতো যেন যুগে যুগে আমি জাগ্রত থাকি। এই আমার কামনা, এই আমার সাধনা। তাই সুপ্তি আজ আমার চোখ বাঁধ্‌তে পারে নি।

বিশ্বের অকল্যাণ কে কোথায় ঘুমিয়ে গেছে তারই একটা ধারাবাহিক ইতিহাস। সমাজের অকল্যাণ জাতির অকল্যাণ দেশের অকল্যাণ কারা কোথায় ঘুমিয়ে পড়েছে তারই একটা

কড়া ক্রান্তিতক্ হিসেব। এই অনাদি অনন্ত প্রবহমান কাল-স্রোতকে শয্যা করে কোথায় কারা গা ঢেলে দিয়ে ঘুমিয়ে গেছে?—কোথায় কারা সুপ্তির আবাহন গান করছে? কোথায় কারা সুপ্তিকে প্রেয় করে' তুলেছে? তারি নির্ভুল অঙ্কপাত বিশ্ববিধাতার হিসেবের খাতায় দাগ কাটছে। এই সুপ্তি নানা লোকের।—প্রাণ-লোকের, মানস-লোকের, অতীন্দ্রিয়-লোকের। ইউরোপ অতীন্দ্রিয় লোককে ঘুম পাড়িয়ে প্রাণ-লোককে জাগ্রত করেছে এবং সেই জাগ্রত প্রাণের দৃষ্টি দিয়ে তার মানস-লোকের জাগরণের রঙ্ ধরিয়েছে। এই এক দিকের জাগরণ মানুষের অন্য দিকটাকে দুর্দাম ভাবে অস্বীকার করল। তাই অকল্যাণ যখন এল তখন ইউরোপের নানা সুখ নানা ঐশ্বর্য সে অকল্যাণকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। তখন তার নানা শক্তি এই অকল্যাণকেই ভীষণতর করবার আয়োজনে প্রবুদ্ধ হ'ল। আর আমরা অতীন্দ্রিয় লোককে জাগ্রত করবার সাধনায় প্রাণ-লোককে মানস-লোককে কঠোর অভিসম্পাতে ঘুম পাড়িয়েছি। এই এক দিকের চেষ্টা অন্যদিকের ধর্মাধর্মকে অবজ্ঞা ভরে অস্বীকার করল। তাই অকল্যাণ যখন এলো, তখন কৈবল্যানন্দ কিছুতেই সে অকল্যাণকে দূরে রাখতে সমর্থ হ'ল না। তখন আমাদের নানা মন্ত্র-তন্ত্র-যন্ত্র সেই অকল্যাণকেই কদর্যতর করে' তোলবার কাজে নিযুক্ত হ'ল। মানুষ এই লোক-ত্রয়ে যখন যুগপৎ জাগ্রত হ'য়ে উঠবে তখনই তার নিগূঢ় পূর্ণ রহস্যের প্রকাশের মাঝে পরম কল্যাণ

প্রতিষ্ঠা পাবে—যে কল্যাণ ভোগের আঘাতেও শোণিত-রাঙা হ'য়ে উঠবে না, অতীন্দ্রিয়ের বাতাসেও মৃত্যু-মলিন হ'য়ে পড়বে না। পরা, অপরা, বিদ্যা, অবিদ্যা, পরম ব্রহ্মের নাম রূপ প্রকাশের মাঝে এ দুই-ই নিত্য। পরা-বিদ্যা ও অপরা-বিদ্যা এ দুই-ই বিদ্যা। এর কোন একটির অবহেলায় জ্ঞান অসম্পূর্ণ, জীবন অসম্পূর্ণ। এর যে কোন একটিকে অবজ্ঞার ফল অন্ধকার।

তাই আজ আমাদের বাণী, জাগ্রত করবার বাণী। যে বাণী কেবলমাত্র শুদ্ধ ব্রহ্ম সত্তাকেই জাগাবে না, জাগাবে সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাণকে মনকে বুদ্ধিকেও। সে বাণী কেবল স্বর্গের নন্দনকাননেই পারিজাত ফোটাবে না, এই মর্ত্যের মাটীর ক্ষেতেও ফসল ফলাবে। যে বাণী আজ প্রচার করবে—প্রয়োজন আছে গো যেমন ঊর্ধ্বলোকের আলোকের তেমনি এই ধমনীতে ধমনীতে শোণিতেরও। যে বাণীতে মর্ত্য স্বর্গকে ভয় করবে না। যে বাণীতে এই মর্ত্যের ধূলির পরেই প্রস্ফুটিত স্নেহ-শিশিরসিক্ত কিশোরী হিয়া স্বর্গের পারিজাতের মতোই সৌরভ ও স্বপ্ন বিতরণ করবে।

কেননা জীবনে স্বপ্নের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে তন্দ্রালসের নয়, জাগ্রতের—নির্ভুলভাবে জাগ্রতের। তন্দ্রালসের স্বপ্নে স্বপ্নই তন্দ্রালসকে স্বপ্নবৎ করে' তোলে, আর জাগ্রতের স্বপ্নে জাগ্রতই স্বপ্নকে মূর্ত করে' তোলে। তন্দ্রালোকের স্বপ্ন তন্দ্রালসকে নিদ্রাতুর করে আর জাগ্রতের স্বপ্ন জাগ্রতকে দৃষ্টিদান করে। চাই সেই স্বপ্ন যে স্বপ্ন অন্ধ করে না চক্ষুষ্মান

করে—যে স্বপ্ন কায়াকে ছায়া করে' তোলে না, ছায়াকে কায়া দান করে।

জীবনে স্বপ্নের প্রয়োজন আছে, কেননা স্বপ্নই মানুষকে মুক্তি দান করছে তার অতীতের সঞ্চয় থেকে, তার বর্তমানের গণ্ডী থেকে। মানুষের এগিয়ে চলার পথের আগে আগে স্বপ্নই হাতছানি দিয়ে দিয়ে চলেছে। স্বর্ণপক্ষ মেলে দিয়ে স্বপ্ন বল্‌ছে,—হে মানুষ! আমার স্বর্ণ পাখার আলোরশ্মির জ্যোতি রেখা ধরে' তোমার গণ্ডী উত্তীর্ণ হও! হে সঞ্চয়ি! তোমার সঞ্চয়কে আগলে তাকে সত্য করে' তুলতে পারবে না। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। সঞ্চয় তার শক্তির অবদান নিয়ে তোমার পিছে পিছে আসবে। সঞ্চয় যেখানে অটল সেখানে তার দান মৃত্যু।

জীবনে স্বপ্নের প্রয়োজন আছে। কী সে স্বপ্ন একদিন দেখেছিল বৃক্ষকোটরবাসী মানুষ! তাই তাকে বৃক্ষকোটর-ছাড়া করল—তাই অরণ্য কেটে পল্লী বসল। কী সে স্বপ্ন একদিন দেখেছিল পল্লীবাসী মানুষ! তাই সে পল্লীছাড়া হ'ল। বৃহৎ বৃহৎ হর্ম্যে সৌধে অট্টালিকায় নগর নগরী নির্মিত হল। প্রশস্ত রাজপথ পাশে পাশে বিপণিশ্রেণী ভাণ্ডার মুক্ত করে' দিল। যানবাহনে কলকব্জায় আশা আকাঙ্ক্ষায় দিবসের শান্ত অবসর কর্ম্মমুখর হ'ল। নৃত্য-গীত-নাট্যশালে শালে নৃত্য-গীত-নাট্যে মৌন রজনী রঙিন হ'য়ে উঠল। কিন্তু কী সে স্বপ্ন একদিন দেখল নাগরিক! তাই ভোগাভিলাষী, আরামবিলাসী মানুষ সাগর পাড়ি দিল। কী

সে স্বপ্ন একদিন দেখল সেই সাগর পারের মানুষ! তাই তার নামাঙ্কিত তরণীতে তরণীতে সপ্ত সাগরের অশান্ত দুর্দাম বক্ষ ছেয়ে গেল। তবুও স্বপ্নের সমাপ্তি নেই! এই স্বপ্নের আলোরশ্মির জ্যোতি রেখা ধরে' গগন-বিহারী বিহঙ্গমের সঙ্গে তার সখ্য স্থাপনা হ'ল। তার দুরাশার সীমারেখা সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহে গিয়ে ঠেক্‌ল। জীবনে স্বপ্নের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে তন্দ্রালসের নয়—জাগ্রতের। তাই এই জ্যোৎস্না-পরিপ্লাবিত প্রসন্নতা-পরিপূরিত বাঞ্ছিত রজনীতে আমি জাগ্রত।

ও আমি একা।

আমি একা। জানি যুগলই ঈশ্বরের সংসারের নিয়ম। যুগলেই আনন্দ। তাই ভগবান যুগলরূপে বৃন্দাবনে লীলা কর্‌লেন। যুগলেই মিলন—সেই মিলনেই আনন্দ। তাই ত কোমল লতিকা বনস্পতি-শাখা জড়িয়ে দোদুল্যমানা—তাই ত কল্লোলিনী কলকণ্ঠে সাগরাভিসারিকা। যুগলেই আনন্দ—তাই ভগবান মানুষের হৃদয়ে প্রেম দিয়েছেন। তাই পুরুষ প্রকৃতি, মরাল মরালী, শুকসারী, চক্রবাক চক্রবাকী। ক্ষুদ্র পতঙ্গটি পর্যন্ত একা নেই।

যুগলে আনন্দ। কিন্তু একে কি আনন্দ নেই? স্রোতস্বিনীর কলতানে মিষ্টতা আছে—কিন্তু সমীরণের নিঃশব্দ পাদসঞ্চার কি স্নিগ্ধতা বিতরণ করে না? যেমন শত সহস্র বাদ্যযন্ত্রের ঐক্যতান কর্ণসুখ তৃপ্তিকর—তেমনি আবার এই মধ্য রজনীর নীরবতা সর্বদুঃখ সর্বস্মৃতিহর। এই নীরবতা—

গভীর, নিবিড় নীরবতা—আপনাকে ভুলিয়ে দেয়। কান পেতে থাক, ঐ নীরবতা শুন্‌তে পাবে। ঐ নীরবতা শুন্‌তে শুন্‌তে তাতে সমস্ত ডুবে যায়। মনে হয় যেন জগতে আর কিছু নেই—সেই বিরাট মহান্ স্তব্ধ গভীর নীরবতা আর স্বকীয় বক্ষ-স্পন্দন। তারপর ক্রমে ক্রমে যেন সে বক্ষস্পন্দনও থেমে যায়। শ্বাস প্রশ্বাস আর চলে না—বক্ষ আর কম্পিত হয় না। তারপর নিজ অস্তিত্ব সেই বিরাট নীরবতার মধ্যে লয় হয়। তারপর আর কিছুই নেই--শুধু সেই নীরব সমাধি। পশুপক্ষী বৃক্ষলতা চন্দ্র তারকা সব লুপ্ত। শুধু এই ত্রিভুবন ব্যেপে কেমন এক নিথর ব্যাপার! নিবিড় স্তব্ধতা ব্যাপ্ত ব্যোম্!

তাই আমি একা। যুগলে কি এই অনুভূতি আসে। যেখানে প্রিয়জনের কলকণ্ঠে কর্ণদ্বয় ঝঙ্কৃত হতে থাকে, যেখানে তার স্পর্শে শরীরে বিদ্যুৎ খেলে যায় সেখানে এই উপলব্ধি আসবে কি করে'? তাই আমি এই জ্যোৎস্না-বিধৌত রজনীতে একা। যেখানে সুন্দরীর কলকণ্ঠের কাকলী, যেখানে চরণ নূপুরের রুণুঝুনু ঝঙ্কারের তানে তানে বিভঙ্গ উচ্ছ্বাস, যেখানে ঘনকৃষ্ণ ভ্রূযুগ শোভিত সুনিবিড় নয়নের নিবিড়তর বিদ্যুৎদামতুল্য কটাক্ষ সেখানে যে এই অনুভূতির প্রবেশদ্বার রুদ্ধ। তাই আমি আজ একা।

আর আমি আজ একা, কারণ আমার সংসারে আপনার বলবার কেউ নেই। এই সংসারে লক্ষ লক্ষ জীবের মধ্যে বাস করছি তবুও আমি একা। ঐ আকাশে কত কোটি কোটি

নক্ষত্র জ্বলছে—কত কোটি কে জানে—একত্রে গায়ে গায়ে পুঞ্জে পুঞ্জে অনাদি অসীম শক্তির পরিচয় জ্ঞাপন করছে—কিন্তু তথাপি এক একটি তারকা একা। একত্র বসবাস, তথাপি একা। সেইরূপ আমিও একা।

আমি যেন একাই থাকি। হে অন্তর দেবতা বিশ্বপ্রেমে যেন আমার হৃদয় আপ্লুত হয়, কিন্তু আমি যেন একাই থাকি। লক্ষ কোটি সুহৃদে পরিবৃত হ'য়েও যেন আমার এই একাকিত্ব না যায়। লক্ষ জীবকে ভালবেসেও যেন আমি একাই থাকি। আমাকে যেন মায়াজালের মোহন কুহক পরিবেষ্টন করতে না পারে। যে মায়ার কুহক মানুষকে দুঃখের সাগরে নিক্ষেপ করে সেই মায়া যেন আমাকে অধিকার করতে না পারে। যে দুঃখের সাগর মন্থন করে অশান্তির হলাহল উত্থিত হয় সেই দুঃখ যেন আমার ভূষণ না হয়। তাই আমি শত বান্ধবেও একা।

এই একাকিত্বে সুখ নাই, শান্তি আছে। এই একাকিত্বে আনন্দ আছে, দুঃখ নেই ; নিশীথের নীরবতা আছে, দিবসের উদ্দীপনা নেই। এই একাকিত্বে একটা আপনা-ভরা ভাব আছে। যখন মধ্য রজনীর নীরবতার মধ্যে বসে বসে ভাবি এই বিশাল পৃথিবীতে কোটি কোটি জীব বাস করছে, কিন্তু আমি একা—যখন ভাবি আমার ভাই নেই, বন্ধু নেই, আপন নেই পর নেই, প্রিয় নেই, অপ্রিয় নেই, জ্ঞান নেই, গরিমা নেই, তখন যেন একটা পূর্ণতার ভাব ব'য়ে যায়—অশান্ত আকাঙ্ক্ষার ব্যস্ত কলরোল-ক্লিষ্ট ধরিত্রীর দীর্ঘশ্বাসতপ্ত বক্ষে একটু সুশীতল

স্নিগ্ধতার অবলেপে জীবন-দেবতা জুড়িয়ে যায়। তাই আমি একা।

আর আমি আজ একা-কারণ আমি যে আবার বাঞ্ছিতের পথে চেয়ে আছি। পরম বিরহে যে চাই পরম মিলন। এই পরম মিলনে আমি যুগল হব। তখন যুগলের আনন্দ যুগলের খেলা। যুগলের প্রেম যুগলের অভিযান। এই পরম মিলন আর সকল মিলনকে মিথ্যার কবল থেকে উদ্ধার করে' সার্থক করবে।

এসো এসো বাঞ্ছিত আমার; ধীরে ধীরে অবতরণ করে' আমার হৃদয়-মন্দিরে প্রবেশ কর। ধীরে ধীরে তোমার রক্তোৎপলতুল্য চরণের ছায়া দ্বারা আমার শ্মশানসদৃশ হৃদয়কে আবৃত কর। ধীরে ধীরে তোমার চরণ-নূপুরের ভুবনমোহন রুণুঝুনু নিক্কনায় আমার রুদ্ধ হৃদয়ের অর্গলিত কবাট খুলে দাও। এসো এসো আমার অন্তরতম—লক্ষ লক্ষ নরনারী-বাঞ্ছিত, কোটি কোটি দেব-ঈপ্সিত—এসো আজ তুমি আমার এই তৃষিত বক্ষের মাঝখানে। এসো এসো শ্রেয়তম আজি আমার এই হৃদয়-শ্মশানে তোমার ললিত স্পর্শে মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত করে' দাও। তখন এই হৃদয়-শ্মশানে ফুল ফুটবে—এই হৃদয়-গগনে চাঁদ উঠবে, স্নিগ্ধ মন্দ পবন বইবে এবং পক্ষীকূজনে চারিদিক আনন্দ-মুখর হ'য়ে উঠবে। এসো এসো দুর্লভ! আমার মরমের দ্বারা আজ তোমার চরণ-নূপুরের মঙ্গল নাদে ধ্বনিত করে' তোল এবং সেই মঙ্গল নাদের প্রতিধ্বনি প্রত্যেক নরনারীর মরমের দ্বারে বিচ্ছুরিত

করে' দিয়ে তোমারই বিরহ জাগিয়ে তোল। এসো এসো বাঞ্ছিত! মরুভূমে মন্দাকিনী ধারা সদৃশ, অন্ধকার অমানিশায় পূর্ণ চন্দ্রের মতো, মসীময়ী তমসাচ্ছন্ন রজনীর শেষে স্নিগ্ধ ঊষার শান্ত আলোকের ন্যায় আমার এই হৃদয়-মন্দিরে উদয় হও। হে প্রেমময়! আমি তোমারই প্রেমাকাঙ্ক্ষী, হে শক্তিময় আমি তোমারই বিরহে তোমারই প্রণয়ে ব্যথিত, হে আনন্দময় আমি আনন্দেরই আজীবন ভিখারী—কৃপা কর—এসো।

মহাপ্রলয়ের দিনে

চতুর্দিকেই জল থই থই করছে। নিম্নে অসীম বারিরাশি, ঊর্ধ্বে অনন্ত ব্যোম—শব্দহীন, স্পন্দনহীন, এক ঘোর মূর্চ্ছায় অভিভূত। বায়ু নিশ্চল, আদিত্য তিমিরাবৃত, দিন রাত্রি এক। মানব পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ লতা তৃণ গুল্ম সব বিলুপ্ত—শুধু নিম্নে নিশ্চল বারিরাশি, ঊর্ধ্বে স্পন্দ-বিহীন ব্যোম! আর সেই ব্যোমে একাকী মার্কণ্ডেয়। দক্ষিণে সেই জল ধূ—ধূ—ধূ। তা'তে তরঙ্গের উলসি-বিনসি নেই—নৃত্যের সে কল কল ছল ছল হাস্য নেই! বামে সেই জল—ধূ—ধূ—ধূ! তা'তে তটিনীর সে রাগ-রঙ্গিণী গতিভঙ্গী নেই—তার সে হৃদিকোষ—পরকাশা কল কলভাষা নেই! সম্মুখে পশ্চাতে সেই জল—ধূ—ধূ—ধূ! স্তব্ধ শান্ত মৌন; অচঞ্চল নির্বাক বিরাট! আজি একি করলে

প্রভু! আজ তোমার একি লীলা! ছায়াবাজির ন্যায় কোথায় বিলুপ্ত হ'ল সেই মানবজাতি—কোথায় সেই মানবজাতির জ্ঞানগরিমা-প্রদীপ্ত জীবন,—কোথায় তাই সেই বুদ্ধিবৃত্তির অত্যাশ্চর্য নিদর্শন—কোথায় সেই বিজয়স্তম্ভ স্মৃতিসৌধ—কোথায় সে অলকানিন্দিত নগরনগরী—কোথায় আজি তার কাম-মদমত্ত বিলাস বাসনা পরিতৃপ্ত করবার সহস্র সহস্র উপকরণ! কোথায় সে লীলাময়ী নারী অথবা নারীস্বভাবা লীলা! আজ তাদের কেন রসাতলে নিক্ষেপ কর্‌লে প্রভু! এক মুহূর্তের মধ্যে তারা কোথায় বিলুপ্ত হল! আজ সমস্ত লীলার বিরাট অবসান,—আজ সমস্তই ক্ষান্ত এবং শান্ত, লুপ্ত এবং গুপ্ত, গতিহীন এবং রতিহীন। এই গতিরতিহীন ব্রহ্মাণ্ডে একা মানব আমি। এই বিরাট শূন্যে কোথায় যাব কি করব প্রভু! এই বিরামহীন নীরবতা আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত করেছে—এই বিরাট শান্তি আমার প্রাণে ভীতি সঞ্চরণ করেছে—এ দুর্ভেদ্য অন্ধকার আজ আমাকে অন্ধ করেছে। প্রভু আর্তকে ত্রাণ কর, ভয়ার্তের ভয় অপসারিত কর—। অন্ধকে পথ দেখাও।

সহসা সেই বিরাট ব্যোম কম্পিত করে' যেন সলিল গর্ভ হ'তে বজ্রগম্ভীর স্বরে অভয়বাণী উচ্চারিত হ'ল—ন ভেতব্যং ন ভেতব্যং মারুদিহি মারুদিহি! মুহূর্তের মধ্যে সেই নীরবতা বিঘ্নিত হ'য়ে উঠল। মুহূর্তের জন্য সেই মহাপ্রলয়ের কাল-নিশা ভেদ করে' দিক্‌চক্রবালে প্রতিধ্বনিত হ'ল সেই বাণী ন ভেতব্যং ন ভেতব্যং মারুদিহি মারুদিহি! ত্রস্ত মার্কণ্ডেয়

অধিকতর ভীত হয়ে সেই আশ্বাস বাণী শ্রবণ করল। সেই জনপ্রাণীহীন দেশে মনুষ্যকণ্ঠ শুনে তার সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠল—কলেবর কম্পিত হ'ল—সংশয়াকুল চিত্তে ভীত কণ্ঠে মার্কণ্ডেয় উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করল—কস্ত্বং—কে আপনি আমাকে আশ্বাস দিতেছেন, কে আপনি আমাকে এ ঘোর দুর্দিনে, এ কাল জলধির উপরে আমাকে অভয়বাণী শুনাচ্ছেন—আজি এ মহাপ্রলয়ের দিনে, এ দেব-যক্ষ-রক্ষ—নর-কিন্নর হীন বিশ্বে, এ বৃক্ষ-লতা তৃণ গুল্ম—নিরস্ত জলধি মণ্ডলে মনুষ্য কণ্ঠে ঘোষণা করছেন। ন ভেতব্যং ন ভেতব্যং মারুদিহি মারুদিহি—কে আপনি ? প্রকাশ হউন, আমাকে দেখা দিন—আমি দেখতে পারছি না—এ কাল অন্ধকার আমাকে অন্ধ করেছে। উত্তর হ'ল—অবোধ চেয়ে দেখ। দূর হয়ে যাক তোমার অন্ধতা—নয়ন উন্মীলন কর, দেখ আমাকে চিনতে পার কি না ? মার্কণ্ডেয় নয়ন উন্মীলিত করে' চেয়ে দেখল।

মার্কণ্ডেয় দেখল সেই নির্বাক চেতনাবিহীন জনমণ্ডল—জলের উপরিভাগ কাচখণ্ডবৎ প্রতীয়মান হচ্ছে। কোথাও সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম একটু চাঞ্চল্য নেই, কোথাও জলের একটি অণুও স্বস্থান-ভ্রষ্ট হচ্ছে না। স্তব্ধ স্থির সমাধিস্থ। আর সেই স্থির বারিরাশির উপর ভাসমান একখানি বটপত্র। মার্কণ্ডেয় দেখল সেই বটপত্রের উপর শায়িত মহাবিষ্ণু। সেই নীল জলধির উপর, নবীন নীল বটপত্রোপরি শায়িত নীল পটাবৃত শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারী নীলকান্তি মহাবিষ্ণু—

স্থির প্রশান্ত সহাস্য। মার্কণ্ডেয় ভক্তিভরে জোড়করে প্রণত হল।

পরে শক্তি আপনাকে প্রকাশিতা করলেন। স্থির জলরাশি মুহূর্তমধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠল। নির্বাক্ ব্যোম জলকল্লোলে ধ্বনিত হ'ল—জলধির প্রশান্ত হৃদয় গতিচাঞ্চল্যে উদ্বেলিত হ'য়ে উঠল—তরঙ্গমালা আপনাদের উচ্ছ্বসিত করে তুলল। সলিলগর্ভ হতে বসুমতী আপনার লুক্কায়িত মস্তক উত্তোলন করলেন। ধরিত্রীর স্তনপানে বৃক্ষলতা তৃণগুল্ম আবার বর্ধিত হয়ে উঠল। উত্তুঙ্গ ভূধর ভূধারণ করবার জন্য দণ্ডায়মান হ'ল। মলয় পবন বইল। নদনদী প্রবাহিত হ'ল। বিহঙ্গমকুলের কাকলীতে কানন দেশ কূজিত হ'য়ে উঠল। দুর্গম অরণ্য শ্বাপদসমাকুল হ'ল। প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করলেন। মানব জাতি আপনার অধিকার বিস্তার করে ভগবানের সৃষ্টিকে জয়যুক্ত করল।

কিন্তু শোন আজি সেই মহাপ্রলয়ের দিনের বজ্রকণ্ঠ নির্ঘোষিত অভয়বাণী—ন ভেতব্যং ন ভেতব্যং। ভয় করো না মহাপ্রলয়কে, ভয় করো না খণ্ডপ্রলয়কে, ভয় করো না প্রতিদিনের ক্ষুদ্র প্রলয়কে। ভয় করো না দেহের ধ্বংসে—যৌবনের ধ্বংসে—ভয় করো না বার্ধক্য জরা মৃত্যুকে। কাপুরুষের ন্যায় ক্রন্দন করো না।

আপনার চারিদিকে গণ্ডী টেনে স্বর্গ জয়ের কামনা করো না। তা দুর্বলেরই বাঞ্ছনীয়। আপনার চারিদিকে গণ্ডী টেনে আপনাকে শৃঙ্খলিত করো না। তা অজ্ঞানীর প্রয়োজন। তুমি শক্তিময় আনন্দময়। ছিন্ন করে' দাও যত শৃঙ্খলকে—

দূর করে দাও দুর্বলের কাপুরুষের মর্মোক্তি। তুমি মুক্ত, তুমি পুরুষ, বজ্রগম্ভীর স্বরে ঘোষণা কর—ন ভেতব্যং ন ভেতব্যং! নির্বাপিত হোক তোমার তেজে নরকাগ্নির অমূলক ভীতি। বিলুপ্ত হোক তোমার ইঙ্গিতে এ বিশ্ব হতে পাপপুণ্য— দূর হয়ে যাক্ তোমার মন হ'তে কামনা বাসনার শত সহস্র শৃঙ্খল। তুমি মুক্ত, আপনাকে চারিদিকে উন্মুক্ত করে দাও। গগনে বজ্রনির্ঘোষ রবে প্রতিধ্বনিত হ'তে থাকুক ন ভেতব্যং ন ভেতব্যং মারুদিহি মারুদিহি। এ জগতকে ক্লীবের লীলাস্থল হতে দিও না।

জীবন-প্রবাহ

জীবন প্রবাহ কুলু কুলু করে' ছুটে চলেছে।

জীবন প্রবাহ বই কি! প্রবাহিনীর প্রবাহের মতই জীবনপ্রবাহও এঁকেবেঁকে নেচে নেচে ছুটে চলে। এ প্রবাহের কূলও কোথাও সুখরূপ শ্যামল তৃণ-শাদ্বলে আচ্ছাদিত আবার কোথাও দুঃখরূপ কঠিন বন্ধুর তীর বালুকা ও ধূলিরাশিতে সমাচ্ছন্ন। প্রবাহিনী সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে ছুটে চলে সেই বিরাট সিন্ধুর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে—জীবন-প্রবাহও ছুটে চলে অন্তিমে সেই পরম পদ লাভ করবার জন্যে। তাই বলছিলাম—জীবন প্রবাহ বই কি।

আমার জীবন প্রবাহ ত নেচে নেচেই চলেছিল। চারিদিক উল্লাসে উল্লসিত করে আপনাহারা হয়ে ছুটে চলেছিল। কৌমুদী-দীপ্তা রজনীতে কূলে কূলে পরিপূর্ণা তরঙ্গিণীর কলকণ্ঠে

ছলছলায়িত কলহাস্য শুনেছ ? এ সুখময় জীবনপ্রবাহ তেমনি নৃত্যে তেমনি কলহাস্যে ছুটে চলেছিল। কোথাও এতটুকু দুঃখের আভাস এতটুকু কষ্টের ইঙ্গিত ছিল না। সব উজ্জ্বল, প্রসন্ন, হাস্যময়, চারিদিকে তৃপ্তি, শান্তি, আনন্দ! এমনি করেই আমার জীবন-প্রবাহ নেচে নেচে চারিদিকে আনন্দ বিচ্ছুরিত করে ছুটে চলেছিল—সহসা—কে তুমি রূপসী? —আমার ভ্রমণ পথে এসে দাঁড়ালে, মোহিনী রূপসী,—কে তুমি ?

কলকণ্ঠে কলহাস্য থেমে গেল, নৃত্যের গতিভঙ্গী ভুলে গেলুম, বীণা নিস্বন অপেক্ষা মিষ্ট সেই চরণ নূপুরের রুণু ঝুণু ঝঙ্কার আর বাজল না। জীবন-প্রবাহের স্রোত আর চলল না। মুগ্ধ নয়নে দেখতে লাগলাম—তোমার সেই ত্রিভুবন-বিমোহিনী রূপ।

কে তুমি বিজয়িনী, এমন আচম্বিতে আমার জীবন-প্রবাহের গতি থামিয়ে দিলে? প্রবাহ ফিরে দাঁড়াল, স্রোত মিলিয়ে গেল—আমার পলকবিহীন লোচনের অনিমেষ দৃষ্টি বদ্ধ হ'ল তোমার ঐ বিশ্ববিজয়িনী মূর্তিতে।

জীবন-প্রবাহ ছুটতে চাইল না। প্রবাহ তোমাকেই ঘিরে ঘিরে তোমার চতুষ্পার্শ্বে নৃত্য সুরু করল—কিন্তু সে কেবল তোমারই নূপুর গুঞ্জরণের তালে তালে। প্রবাহ বিশ্ব সঙ্গীত ভুলে গেল; তোমারই সঙ্গীতের রাগিণীতে তার কলকণ্ঠ আবার মুখরিত হ'য়ে উঠল—প্রবাহ-হৃদয় আবার আনন্দের কলহাস্যে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠল, কিন্তু সে হাসি সে আনন্দ শুধু তোমার

কৃষ্ণোজ্জ্বল আঁখিতারকার হাস্যেরই প্রতিচ্ছায়া। মুগ্ধ হয়ে দেখলাম তুমি কি সুন্দর!

ঐ সুন্দর নভ নীলিমার নিম্নে এই সুন্দরী পৃথিবীতে কেমন সুন্দর হাস্যে দিক উজ্জ্বলিত করে সুন্দর নৃত্যের তালে ছুটে চলেছিলাম। কিন্তু দেখলাম তোমার আনন্দোৎভাসিত বিশাল লোচনদ্বয়ের একটি মাত্র দৃষ্টি এ সমস্ত অপেক্ষা কত সুন্দর—তোমার ঐ অলক্তক দুগ্ধচম্পক বর্ণাভা দেহের একটি অণু একটি পরমাণু এদের প্রত্যেকের অপেক্ষা কত রমণীয়। কে তুমি বিজয়িনী আমার এই সহজ সুখময় জীবনের পথে এসে আমার নয়ন পথের পথিক হ'লে। আমার দৃষ্টি যে আর ফিরিয়ে নিতে পারলাম না।

ভুলে গেলাম এই পৃথিবী—বিস্মৃত হলাম এই বিশ্ব। তোমার ঐ কুন্দদন্তের হাস্য ব্যতীত এ জগতে আনন্দ কোথায়? তোমার ঐ ইন্দীবরতুল্য লোচনদ্বয়ের কটাক্ষ ব্যতীত এ সংসারে আলোক কোথায়? তুমি ব্যতীত এ মহীতে সুখ কোথায়? দেখলাম তোমার আজানুলম্বিত কৃষ্ণ কুন্তলে ঐ অনন্ত আকাশ ছেয়ে রয়েছে। বৃক্ষে বৃক্ষে শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় ঝুলছে তোমারি বসনের অঞ্চলাগ্র ধরিত্রীর মাটিতে মাটিতে, প্রত্যেক বালুকা কণাতে, বালুকা কণার প্রত্যেক পরমাণুতে অঙ্কিত রয়েছে তোমারি অলক্তকরাগে রঞ্জিত চঞ্চল চরণ পদ্মের পদাঙ্ক। তোমারি সুরভিমিশ্রিত মদিরায় বায়ু হিল্লোল প্রমত্ত। চন্দ্রের দিকে চেয়ে দেখলাম। ও কি চন্দ্র? না ও যে তোমারি মুখ তার অঙ্কে ধারণ করে' বসে আছে। নক্ষত্রের

দিকে চেয়ে দেখলাম। ও যে শুধু তোমারি নয়নের জ্যোতি তার গায় বেধে দীপ্তি পাচ্ছে। আমার নিকট জগতের ত আর কিছুই রইল না। রইলে শুধু তুমি। রইল তোমার নিতম্বস্পর্শী চিক্কণ কৃষ্ণ-কুন্তল। রইল ঐ প্রশান্ত ললাট, ঐ সুবঙ্কিম ভ্রূ, ঐ মোহন নাসিকা। রইল তোমার ঐ কৃষ্ণ কজ্জলে লিপ্ত কৃষ্ণআঁখি-তারকার প্রাণস্পর্শী দৃষ্টি, ঐ রক্তাভ পেলব গণ্ড, ঐ অমিয়-পরিপূরিত বিম্বাধর। রইল ঐ পুষ্পকোমল হৃদয়, ঐ মৃণাল-সদৃশ বাহুবল্লী, ঐ মন্মথমনোহারিণী দেহলতা। রইল—দেখলাম কত কত চন্দ্র ঐ পাদনখে গড়াগড়ি যাচ্ছে। দেখলাম স্বর্গে তুমি, মর্ত্যে তুমি, পাতালে তুমি। বুঝলাম গগনে তুমি, পবনে তুমি, হৃদয়ে তুমি—এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেই তুমি। কে তুমি সুন্দরী আমার জীবন প্রবাহের মধ্যপথে এসে আমাকে তোমাতে ডুবিয়ে দিলে ?. এই কি প্রেম ?

এ প্রেম কিনা জানি না। তবে বুঝলাম আমার সুখ তুমি ; তুমি আমার কাম্য, তুমি আমার প্রাণ ; তুমি ছাড়া আমার জীবন নেই, আমার স্বর্গ নেই ; তুমি ব্যতীত এ জগৎ অন্ধকার, ঐ চন্দ্র কালিমাময়, সূর্য তিমিরাবৃত, নক্ষত্রমণ্ডল লুপ্ত। দেবি ! এ অকিঞ্চিৎকর জীবন গ্রহণ করিবে কি ?

আর এই যদি প্রেম হয়, তবে বুঝলাম, প্রেম সর্বসুখময় নয়। বুঝলাম কুসুমে যেমন কীট আছে, সরোবর হৃদয়ে যেমন শৈবাল আছে, প্রেমেও তেম্‌নি দুঃখ আছে। চন্দ্রের দেহে যেমন অঙ্কিত আছে চন্দ্রের কলঙ্ক, তেমনি প্রেমের সহিত

আবার আসঙ্গলিপ্সা। প্রেম—গহন-জ্যোৎস্না-বিধৌত যামিনীর মোহন স্বপ্ন, কিন্তু হায় তা' গাঢ় মেঘাবৃত বরষা রজনীতে হৃদয় ব্যথিত ক'রে যায়। প্রেম—মলয়াদ্রির চন্দন-সুরভি-মিশ্রিত সমীরণের মত হৃদয়-কন্দরে প্রবেশ ক'রে তার মোহন-সৌরভে জীবন আমোদিত ক'রে তোলে, কিন্তু হায়, অন্তরের ভোগাকাঙ্ক্ষারূপ বদ্ধ বায়ুতে তাও শীঘ্রই দূষিত হ'য়ে ওঠে। প্রেমের প্রথম বড়ই কোমল ; তাই বড়ই সুখদায়ক। প্রেম প্রথম দর্শনে বড়ই সুকুমার—একটুকু চোখের দেখা, একটুকু কণ্ঠবাণী, তাতেই তৃপ্তি। কিন্তু হায় প্রেম যখন ধীরে ধীরে বর্ধিত হ'য়ে হ'য়ে যৌবনে উপস্থিত হয়, তখন সেই হৃদয়-মথিত-করা আকাঙ্ক্ষা, সেই পরাণ-দগ্ধ-করা আসঙ্গলিপ্সা জীবনকে ভস্মীভূত করতে থাকে। প্রেম নন্দন-কাননের সুধা, কিন্তু হায়! তাতে বিষের অংশ আছে। একবার গলাধঃকরণ করলে জর্জরিত হ'তেই হবে। দেবি! কৃপাকটাক্ষে আমার হৃদয় বুঝবে কি ?

প্রেমে বিষ আছে, নইলে এ জ্বালা, এ অতৃপ্তি কেন ? তুমি এত নিকট তথাপি আবার এত দূর কেন ? তোমার ঐ ললিত লবঙ্গলতিকার ন্যায় দেহলতাকে এ উত্তপ্ত বক্ষে স্থাপন করবার এ উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা কেন ? সে বিষে আমার হৃদয়-স্থল ভস্ম হ'য়েছে, নয়নদ্বয় কালিমালিপ্ত হ'য়েছে, প্রাণ শক্তিহীন হ'য়েছে, জীবন সুখহীন হ'য়েছে। এ ব্যাধির মহৌষধ তুমি, এ জীবন-মৃতের সঞ্জীবনী-শক্তি তুমি, এ বিষের অমৃত তুমি। দেবি! এ অকিঞ্চিৎকর জীবনকে রক্ষা করবে কি ?

জীবন-প্রবাহ তোমাকে ঘিরে ঘিরে নাচ্‌ল, কিন্তু কই তোমাকে ধর্‌তে পারল কই ? দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বর্ষের পর বর্ষ কেটে গেল, কিন্তু কই তুমি আমার হ'লে কই ? আমাকে তোমার ক'রলে যদি তবে তা' গ্রহণ ক'রলে না কেন ? তোমায় দেখতে দেখতে আনন্দের হাসি কোথায় মিলিয়ে গেল। তোমাকে দিনে দিনে, মাসে মাসে, বর্ষে বর্ষে অনেক দেখেছি, তোমার দর্শনেই আর তেমন সুখ নেই, আর সে আনন্দ নেই। তোমায় এখন আরও নিকটে—আরও সমীপে চাই—তোমায় স্পর্শ কর্‌তে চাই। আমার এই বলিষ্ঠ বক্ষের তলে—যেখানে হৃদয় কম্পিত হচ্ছে তোমায় সেইখানে রাখতে চাই। তবেই সুখ, তবেই শান্তি, তবেই তৃপ্তি, তবেই আনন্দ।

জানি না কিসে তোমার মনোযোগ আকৃষ্ট করল। তুমি আমার দিকে চেয়ে দেখ্‌লে—দেখ্‌লে আমার নয়নে কি বেদনা অঙ্কিত, আননে কি যন্ত্রণা সূচিত ? করুণায় তোমার চিত্ত ভরে গেল—তুমি তোমার কুসুম-পেলব লতিকার ন্যায় একখানি বাহু আমার দিকে প্রসারিত ক'রে দিলে। উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়-চালিত আমার হস্ত মুহূর্তে তোমার প্রসারিত হস্ত ধারণ ক'রে আমার লালায়িত ওষ্ঠে স্পর্শ কর্‌ল। সেই আবেগ-উচ্ছ্বাস-বিজড়িত, পিষিত-হৃদয়, বেদনাময় উষ্ণ চুম্বন তোমার স্নায়ুতে স্নায়ুতে একটা বিদ্যুতবহ্নি চালিয়ে দিল, তোমার ক্ষীণ দেহলতা সে বিদ্যুৎবেগে প্রকম্পিত হ'য়ে উঠ্‌ল—তুমি বাত্যাহত লতিকার ন্যায় ঢুলে প'ড়লে। আমার বলিষ্ঠ বাহু তোমার প্রকম্পিত

লতিকার ন্যায় তনুকে ধারণ ক'রল। বাহুতে বাহু যুক্ত হ'ল, বক্ষে বক্ষ সংলগ্ন হ'ল, অধরে অধর একটি বজ্র-বন্ধনীতে আবদ্ধ হ'ল।

অমরাবতীর শত শত অপ্সরীর নৃত্যপটু চঞ্চল চরণের গুঞ্জনকারী রজত-নূপুরের বিভঙ্গ উচ্ছ্বাস—শত শত কিন্নরীর কণ্ঠোত্থিত বিশ্বভুলান মনোহর সঙ্গীত—নন্দনকাননের প্রস্ফুটিত শত শত পারিজাতের মোহন সৌরভ—তুচ্ছ আজ সে সব। তুচ্ছ আজি স্বর্গের সুধা, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, কুবেরের ধন। তুচ্ছ সেই স্বর্গ যে স্বর্গে তুমি নেই—তুচ্ছ সেই ইন্দ্র যে ইন্দ্র তোমাকে লাভ করে নি—তুচ্ছ সেই কুবের, তুচ্ছ সেই কুবেরের ঐশ্বর্য যে ঐশ্বর্য তোমাকে মিলাতে পারে নি। হায়, আমি আর কি বল্‌ব? তোমার বক্ষ আমার বক্ষে, তোমার বাহু আমার বাহুতে, তোমার অধর আমার অধরে। হায়, আমি সেই মুহূর্তে মর্‌লাম না কেন?

আর কিছুই চাইনে। দেশ, কাল, পাত্র, সব মুছে যাক্‌।

পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, তারকা লুপ্ত হোক্‌; সৃষ্টি রসাতলে যাক্‌—রহুক্‌ শুধু হু'খানি বক্ষ—তোমার এবং আমার। রহুক্‌ শুধু হু'খানি বক্ষ, কিন্তু তা'তে একই কম্পন—রহুক্‌ চারিটি আঁখি, কিন্তু তা'তে একটিমাত্র পলকহীন, নিমেষহীন দৃষ্টি। রহুক চারিটি অধর—কিন্তু ত'াতে শুধুই একটি বিরতিহীন, সমাপ্তিহীন চুম্বন—শুধুই এই—আর সব লুপ্ত হোক্‌—মুছে যাক্‌ ধ্বংস হোক্‌। রহুক্‌ শুধু তুমি—আর আমি, আর আমাদের হু'জনকে ঘিরে অনন্ত অসীম নভোমণ্ডল।

আর যেন কুঞ্জে কুঞ্জে বিহঙ্গ ডেকে ফেরে না, আমার কর্ণে যে তার ঝঙ্কার এসে বাজবে। আর যেন মধুময়ী কৌমুদী এ জগতে ব্যাপ্ত করে না—তার আলোক যে আমার আঁখিতারকায় প্রতিভাত হবে। আর যেন স্নিগ্ধ মন্দ পবন বয় না—তার স্পর্শে যে আমার শরীর শিউরে উঠ্‌বে। আর যেন মার্তণ্ড উদিত হয় না—আর যেন দিন আসে না—রাত্রি আসে না। আমি আর কিছুই চাই নে—শব্দ, গন্ধ, রূপ, রস কিছুই চাইনে। নিদ্রা তন্দ্রা কিছুই চাইনে—চাই শুধু তোমাকে। এই বৃহৎ পৃথিবীতে—এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে—এই অনন্ত সৃষ্টিতে চাই শুধু তোমাকে এই সীমাবিহীন গগনের নিম্নে রইব শুধু তুমি আর আমি।

তোমাকে কোথায় রাখব প্রিয়তমে? আমার বক্ষের উপরে? সে যে বহু দূর। আজ আমার এই বক্ষ যে আমার নিকট হ'তে যোজন দূর ব'লে বোধ হ'চ্ছে। এই বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে যেখানে ক্ষণে ক্ষণে উন্মত্ত হৃদয় কম্পিত হচ্ছে, সেইখানে তোমাকে রাখতে পেলে বুঝি তৃপ্তি পাই। এ দেহের ব্যবধান কি লুপ্ত হ'য়ে যায় না? এই রক্তমাংসের বাধা কি অতিক্রম করা যায় না? এ রক্তমাংসের শরীরে যে প্রত্যেক অণুটি প্রত্যেক অণুটির সঙ্গে মিলে যায় না, প্রতিটি রক্তবিন্দু যে প্রতিটি রক্তবিন্দুর সাথে মিশে যায় না,—হৃদয়ের প্রতি কম্পনটি যে প্রতি কম্পনটির মাঝে লুকিয়ে যায় না। একটি দেহ যদি আর একটি দেহে অন্তর্হিত হ'য়ে যেত, একটি হৃদয়ে যদি আর একটি হৃদয়ে তলিয়ে যেত, একটি জীবন যদি আর একটি জীবনে

নিঃশেষে লুপ্ত হ'য়ে যেত তবে বুঝি তৃপ্তি পেতাম। হায়! তোমায় কোথায় রাখবো প্রিয়তমে!

* * * *

পাঁচটি বছর ক্রমে ক্রমে কেটে গেল। এই অনন্ত কালের তুলনায় পাঁচটি বৎসর কতটুকু সময়? সেই পাঁচটি বৎসর পলের পর পল, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ক'রে ধীরে ধীরে কেটে গেল; কিন্তু আজ……

কোথায় গেল সেই স্বপ্নের প্রাসাদ? কোন্ কুহকিনী আজ তাকে আত্মসাৎ ক'রে আমাদের দুইটি জীবনের দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসছে? যে তৃষ্ণা—যে আকাঙ্ক্ষা মনে ক'রেছিলাম যুগে যুগে মিট্‌বে না, আজ তা' কোথায় অন্তর্হিত হ'য়ে গেল? সেই সব আছে—সেই অধর, সেই কুন্তল, সেই হাস্যবিকশিত নয়ন, সেই হাস্য-বিজড়িত আনন, সেই লাবণ্য-লীলায়িত তনু—সেই সব, তবে কোথায় গেল আজ সেই জীবনের মোহন কুহক? আজও নব-পল্লবিত তরুশাখে বিহঙ্গম তেমনি ক'রে গান গায়, তবে প্রিয়াকণ্ঠে আর সে মধুময় সঙ্গীত ওঠে না কেন? আজও অসহ্য-জ্যোৎস্না-আকুলিত যামিনীতে পূর্ণচন্দ্র নীল নভস্তলে তেমনি ক'রে হাসে, তবে প্রিয়ার নয়নে আর সে হাসি ফোটে না কেন? আজও সমীরণ স্পর্শে কল্লোলিনীবুকে বিভঙ্গ বীচিমালায় তেমনি ক'রে মধুময় মুখরতা ফুটে ওঠে, তবে প্রিয়ার চরণ-নূপুর আর তেমন ক'রে গুঞ্জে না কেন? আজ শুধু সেই প্রতিমা রয়েছে; কিন্তু হায়, তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা কোথায় গেল?

জীবন-প্রবাহে আবার বান ডাক্‌ল। জীবন-প্রবাহের যে সঙ্গীত ভুলেছিলাম তার বিস্মৃত সুর কেমন ক'রে যেন ধীরে ধীরে প্রাণে জেগে উঠ্‌ল। বিরাট নীল সিন্ধু—সে যে বহু দূর। এখনও বহুদূর ছুট্‌তে হবে। এ ক্ষুদ্র দেহ ত' সেই বিরাট দেহের সহিতই মিশিয়ে দিতে হবে—এ ক্ষুদ্র রাগিণী ত' সেই উদার সঙ্গীতের সাথেই মিলিয়ে দিতে হবে—এ আশা, এ আকাঙ্ক্ষা, এ তৃষ্ণা ত' সেই অনন্ত সিন্ধুর অতল তলেই ডুবিয়ে দিতে হবে। তাই জীবন-প্রবাহ আবার তালে তালে, নেচে নেচে, গেয়ে গেয়ে চল্‌ল। তাই জীবন-প্রবাহ আবার ছুটে চল্‌ল—কুলু কুলু কুলু। চিত্তপটে অঙ্কিত হ'য়ে রইল হৃদয় বিনিময়ের একটি উজ্জ্বল স্মৃতি।

একটি প্রেমের গান

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়
সোই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবনহি শুনমু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়িনু
না বুঝনু কৈছন কেলি।

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি ॥
কত বিদগধজন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক ॥

এই হচ্ছে গানটা। কিন্তু "লাখে না মিলল এক।"—তাই এমন গান বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসে ঐ একটির দর্শন পেলেম।

(২)

"তিলে তিলে নূতন হোয়।" তাই তো লাখ লাখ যুগেও এ প্রেমের হ্রাস নেই—এ যে তিলে তিলে প্রতি পলে পলে নতুন করছে—নতুন হচ্ছে—মরচে ধরবার অবসরই নেই এতে—স্বাদহীন হবার সম্ভাবনাই নেই এতে। যেখানে পুরাতন সেথা নেই মানুষের অশ্রদ্ধা, অতি পরিচয়ের অবহেলা—যা পুরাতন তাই যে মানুষ অত্যন্ত ক'রে জানে, নিঃশেষ ক'রে জানে। যেখানে মানুষ নিঃশেষ ক'রে জানে সেখানে মানুষের আর চলবার পথ নেই—আকাঙ্ক্ষা সেখানে বেদনাময়—চেষ্টা সেখানে ক্লান্তিজনক অর্থহীন। সেখানে আছে শুধু আরামের বোঝা—আনন্দের অবদান সেখানে নেই। আর আরামের বোঝা সুস্থ ও প্রাণবান মানুষের পক্ষে ঘোর অধর্ম। তাই মানুষের যে প্রেমের লাখ লাখ যুগেও হ্রাস হবে না; লাখ লাখ যুগেও হৃদয়ে হৃদয় রেখে যে প্রেম স্বাদহীন হবে না, সে প্রেম

সম্বন্ধে প্রথম ও প্রধান সর্ত হচ্ছে যে সে-প্রেম যেন তিলে তিলে নূতন করে—সে-প্রেম যেন "তিলে তিলে নূতন হোয়"। তিলে তিলে যদি তা নূতন হ'য়ে না ওঠে তবে আজ যাকে কেঁপে হিয়ায় রাখছি কাল তাকেই ডেকে বিদায় দেব। কারণ জীবনের খেলাই হচ্ছে নতুনের খেলা।

"তিলে তিলে নূতন হোয়।" জীবনের খেলাই হচ্ছে ওই—"তিলে তিলে নূতন হোয়!" কত লক্ষ বৎসর মানুষ বেঁচে আছে—কিন্তু—কিন্তু তবুও সে আপনার কাছে আপনি বোঝা হ'য়ে উঠল না—আপনার কাছে আপনি গলগ্রহের মত হ'য়ে উঠল না—কারণ সে যে "তিলে তিলে নূতন হোয়।" সে তিলে তিলে নূতন হ'য়ে উঠছে, তাই তার আপনার সম্বন্ধে আপনার কৌতূহলের শেষ নেই,—অজ্ঞাত যা, গুপ্ত যা, সুপ্ত যা তা দিনে দিনে বিকশিত হ'য়ে তার চোখের সামনে মনের সামনে ফুটে উঠছে; তাই তার ক্লান্তি নেই, ঔদাসীন্য নেই, বৈরাগ্য নেই। জীবনে যখন এই নতুনকে ঠেকিয়ে রাখব তখনই জীবনের মরণকেও ডেকে আনব। কারণ মানুষের প্রতি পলের মরণই তার প্রতিদিনের জীবনকে গ'ড়ে তুলছে।

তিলে তিলে পলে পলে মানুষ নতুনকে পাচ্ছে ব'লে এ জগতের রঙ্ তার চোখে আজও ফিকে হ'ল না। বাইরের জগৎ হাজার বছর হয়ত সেই একই আছে—সেই বর্ষায় ঘন দেয়ার গুরু গুরু ডাক, কালো মেঘের ঝিলিক হানাহানি, পাগল বাদলের উতল ধারা; সেই শরতের চোখ-গলানো মন-মাতানো জ্যোৎস্না; সেই বসন্তের সবুজ বনের অবুঝ হাওয়ার

মাতামাতি ; সেই শীতের রহস্যময় কুজ্ঝটিকা ঘেরা যেন স্বপ্নের জগৎ—হয়ত সেই সবই এক—কিন্তু মানুষ পুরাতনকে ত্যাগ ক'রে, তার উপরে বিস্মৃতির তুলি বুলিয়ে তার অন্তরের জগতে প্রতি নিমেষে নতুনের জন্যে আসন পাতছে। তার ভয় কি জানি যদি কোনো কিছুকেই আবার সে নতুন ক'রে না পায়—কি জানি যদি পুরাতন তার গুরুগম্ভীর অতিমাত্র চেনা মুখ নিয়ে হাজির হয়। সে চেনার মধ্যে যে চাইবার কিছু নেই—খুঁজবার কিছু নেই—বুঝবার কিছু নেই—তার পিছনে যে একটা মস্ত কালো দাঁড়ি সমাপ্তির শেষ টেনে ব'সে আছে। আর সমাপ্তিকে নিয়ে তো মানুষ বাঁচতে পারে না—সমাপ্তি থাকলে যে মানুষের সমস্ত প্রকৃতি তার মন বুদ্ধি চিত্ত, তার কর্ম-প্রেরণা ভোগ-প্রেরণা সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই মানুষের জীবনেরও ঐ সত্য—তা "তিলে তিলে নূতন হোয়"। জীবন্মৃত যে তার অন্তরেই নূতনের জন্যে আসন পাতা নেই—আর নূতনকে বরণ ক'রে নিতে নারাজ যে তারই মরণ।

"তিলে তিলে নূতন হোয়।" তাই জীবন এত মধুর, এত রসযুক্ত।

"আজ আমাদের সাধের বৃন্দাবন
নিত্য নূতন নূতন।"

এই যে জীবন-বৃন্দাবন তা নিত্য নূতন নূতন। নিত্য নূতন মুকুট মাথায় দিয়ে জীবন-দেবতা নিত্য নবরসে অভিষিক্ত হ'য়ে নিত্য নূতন পথে চলেছেন। তাইতো দেখি মানুষ অনন্ত—বাইরের রক্ত-মাংস তার মনের পাতায় দাঁড়ি টানে নি।

বাহিরকে সে অন্তরের অনন্ত-রহস্যে মণ্ডিত ক'রে নিত্য নূতনের খেলা খেলছে। তাই এই বাহিরের জগত তার অন্তরের রঙে "তিলে তিলে নূতন হোয়"।

নতুন যেখানে আপনার পথ পায়নি—যেখানে সে অবজ্ঞাত হয়েছে—মানুষের মনে-প্রাণে যেখানে সে ভয় বা তাচ্ছিল্য জাগিয়ে গিয়েছে, সেইখানেই পুরাতন ধীরে ধীরে মানুষকে জড়ে পরিণত ক'রে অমৃতের কাছ থেকে তাকে দূরে অতিদূরে টেনে নিয়ে গেছে। মানুষের জীবনে সেখানে অনন্ত সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ। সেখানে মানুষের আত্মার চাইতে মন, মনের চাইতে দেহের রক্ত মাংস বড় হ'য়ে উঠে ধীরে ধীরে তাকে মাটির দিকে টেনে নিয়ে গেছে—মাটিতে শিকড় গেড়ে তাকে উদ্ভিদে পরিণত করেছে—উদ্ভিদ ধীরে ধীরে পাথরে পরিণতি লাভ করেছে। নূতনের মধ্যে রয়েছে গতি—তাই সেখানে রয়েছে মানুষের কল্যাণ। তাই মানুষের জীবনের একটা বড় সত্য হচ্ছে ঐ যে তা "তিলে তিলে নূতন হোয়"।

(৩)

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

জন্ম ভ'রে রূপ দেখলুম তবু নয়নের তৃপ্তি হ'ল না—নয়নের বৈরাগ্য এলো না। কারণ আমি যে সে রূপ দেখে তিলে তিলে নতুন হচ্ছি—কারণ সে রূপ যে আমার চোখে তিলে তিলে নতুন হ'য়ে উঠছে।

কি এ রূপ? কিসের এ রূপ? যা দেখে জন্ম জন্মান্তরেও আশ মিটল না—জন্ম জন্মান্তরেও আশ মিটবে না। এ রূপ কি শুধু ঐ মুখের? তার সুবিন্যস্ত পেশীসমূহের? নিটোল সুগোল গণ্ডের? নির্ভুল পরিমিত রেখা-বন্ধনীর? শ্যাম দূর্বাদলসন্নিভ বা চম্পক-বিনিন্দিত বর্ণের? বনস্পতি সদৃশ উন্নত ঋজু দেহযষ্টি বা ললিত-লবঙ্গ-লতাতুল্য লীলায়িত দেহলতার? না। তা যদি হ'ত তবে তা নিষ্ঠুর তৃপ্তি এনে সমাপ্তির গান গাইত। না, এ-রূপ আমি সাদা চোখে খালি মুখেই দেখি নি—চোখের পিছনে যে মন আছে, সেই মন দিয়ে দেখেছি—মনের পিছনে যে আত্মা আছে সেই আত্মা দিয়ে স্পর্শ করেছি—তাই এ-রূপের নশ্বরতা নেই—তাই এ-রূপের মাদকতার বিরতি নেই। ঐ বাইরের রূপের পিছনে, বাইরের রূপের অন্তরে, বাইরের রূপকে ডুবিয়ে ছাপিয়ে যে একটা অনির্বচনীয়তা আছে, আমার অন্তরের অনির্বচনীয়তার সঙ্গে সেই অনির্বচনীয়তার যোগ হয়েছে, তাই এ-রূপের সৌন্দর্য জন্ম জন্মান্তরেও আমার কাছে মলিন হ'ল না—তাই ওর নেশা আমার লেগেই রইল—তাই

"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি।"

এ-রূপ যদি কেবল রক্ত মাংসের রূপ হ'ত, তবে হিয়ার স্পন্দন থেমে গিয়ে ছুদিনে ক্রন্দন উঠত।

কবি লিখছেন—"যেখানে পদ্মফুলের নির্বচনীয়তা সেখানে তার আকার আয়তন ও বস্তুপরিমাণ সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ ভাবে তার

আপনারই। কিন্তু যেখানে পদ্মটি অনির্বচনীয় সেখানে সে যেন আপনার সমস্তটার চেয়েও আপনি অনেক বেশি! * * * পদ্মের যেখানে এই বেশি সেখানে তার সঙ্গে আমার বেশিরও একটা গভীর মিল। তাই তো গাহিতে পারি

কমল-মুকুলদল খুলিল!
দুলিল রে খুলিল
মানস-সরসে রস পুলকে
পলকে পলকে ঢেউ তুলিল!
গগন মগন হ'ল গন্ধে
সমীরণ মূর্ছে আনন্দে,
গুন্ গুন্ গুঞ্জন ছন্দে
মধুকর ঘিরি ঘিরি বন্দে;
নিখিল ভুবন মন ভুলিল
মন ভুলিল রে
মন ভুলিল!"

মন কেবল ভুলিলই নয়—মন ভুলেই রইল—লাখ লাখ যুগ ভুলে রইল—জন্ম জন্মান্তর ভুলে রইল। এ কার গুণে? কিসের গুণে?—ঐ অনির্বচনীয়তা, যারই কেবল জরা নেই, মৃত্যু নেই, আদি নেই, অন্ত নেই। এ অনির্বচনীয়তা বচনে বলতে পারিনে—চেষ্টা করি মাত্র, বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা করতে পারিনে—দর্শন করি মাত্র, তাই তো

সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু
শ্রুতি পথে পরশ না গেল।

তাই

কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়িনু
না বুঝনু কৈছন কেলি।

এই অনির্বচনীয়তা আমাদের ভুলিয়ে রেখেছে, এই জগতে। নইলে কোনদিন মানুষ সব ত্যাগ করে·নির্বচনের জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠত—চোখ বুঁজে সব তপস্যায় ব'সে যেত—চোখ খুলে আর চাইতই না কোনো দিকে। কিন্তু এই অনির্বচনীয়তা তাকে যুগে যুগে ঔদাসীন্য থেকে মুক্তি দিচ্ছে—বৈরাগ্য থেকে ফিরিয়ে আনছে। এই অনির্বচনীয়তাই তার জীবনের গভীরতম সত্য, তাই চোখের অশ্রু মনের ব্যথা প্রাণের ব্যর্থতার ভিতর দিয়েও সে বেঁচে এসেছে। কিন্তু এই অন্তরতম অনির্বচনীয়তাকে আমাদের মন জান্‌ছেনা, বুদ্ধি বুঝ্‌ছেনা। এই অনির্বচনীয়তাকে মনে প্রাণে চিত্তে বুদ্ধিতে মানুষের সমস্ত প্রকৃতিতে সত্য ক'রে তোলা জাগ্রত ক'রে তোলাই হচ্ছে মানুষের আজীবনের সাধনা।

(৪)

এই অনির্বচনীয়তারই সন্ধান হিন্দু একদিন পেয়েছিল—এই অনির্বচনীয়তার উৎস কোথায় তা টের পেয়েছিল। তাই সেদিন সে বাহির থেকে ভিতরে ফিরল। সেদিন সে খোলা চোখ বন্ধ করল—মন বুদ্ধিকে রুদ্ধ করল—হাত বাঁধল, পা বাঁধল। সেদিন সে পদ্মাসনে ব'সে গেল তপস্যায় অনির্বচনীয়তার ঐ উৎসে পৌঁছতে হবে ব'লে—তাতে

করতে হবে অবগাহন, জীবনের গভীরতম সত্যকে জানতে হবে ব'লে।

বাইরে তার দুর্গতির সীমা রইল না। তার স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তি নিলামে চড়ল—তার সংসার অশ্রুতে অশ্রুতে সিক্ত হ'ল, হাহাকারে হাহাকারে পূর্ণ হ'ল—কুটীরের দ্বারে তার দুর্ভিক্ষ রাক্ষস করাল বদন ব্যাদান ক'রে তাকে ভয় দেখাতে লাগল—মহামারী প্রেত তার যোগাসনের চারিদিকে অট্টহাস্য ক'রে ক'রে নাচতে লাগল—কিন্তু হিন্দু টল্‌ল না, যোগীর ধ্যান ভাঙ্‌ল না—রক্ত মাংসের দুঃখ, চোখের অশ্রু, প্রাণের ব্যথা মানুষকে জয় করতে পারল না—ধ্রুবতারার মতো একটি তারা শুধু তার ইচ্ছাশক্তির সামনে জ্বল্‌ জ্বল্‌ ক'রে জেগে রইল—ঐ অনির্বচনীয়তাকে জানতে হবে—তার উৎসে পৌঁছতে হবে—তাতে অবগাহন করতে, সৃষ্টির নিগূঢ়তম সত্যকে আপনার করতে হবে। এমনি হিন্দুর একাগ্রতা, এমনি হিন্দুর শক্তি—এ-শক্তি যেদিন বেরিয়ে এসে জগত-লীলায় মাতবে সেদিন সে হবে অপরাজেয় অরিন্দম।

কিন্তু সকল সত্য অনুষ্ঠান মিথ্যাও কিছু জড়িয়ে আনে—যেমন প্লাবনের জল আবর্জনারাশি কুড়িয়ে আনে। তাই রব উঠল—ঐ শেষ, ঐ অন্তরের অনির্বচনীয়তার উৎসে পৌঁছা—ঐ খানে সমাধি, মহা সমাধি—তারপর অক্ষর ব্রহ্মে নির্বাণ মানব-জন্মের চরম সার্থকতা।

কিন্তু ঐ শেষ নয়—অনির্বচনীয়তা শেষ নয়—ওটা যে সৃষ্টির আরম্ভ—মানুষের ওটাই যে প্রারম্ভ। ঐ প্রারম্ভ থেকে

মানুষকে সজ্ঞানে আরম্ভ করতে হবে। ঐ অনির্বচনীয় উৎসে অবগাহন ক'রে দেহ মন প্রাণ বুদ্ধিকে অমৃতময় ক'রে হিন্দুকে আবার বেরিয়ে আসতে হবে অমর হ'য়ে শক্তিমান হ'য়ে। সংসারের চোখের অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে তার মুখের হাসি আবার ফুটিয়ে তুলতে হবে—মহাকালের অনুচরকে দূর করতে হবে—মানুষের সমস্ত প্রকৃতিকে ঐ অনির্বচনীয়তায় অভিষেক ক'রে সত্য ক'রে তুলতে হবে—মানুষের সে সত্যকে জগতে সার্থক ক'রে তুলতে হবে। বিশ্ববাসীকে ঐ অনির্বচনীয়তার সংবাদ দিতে হবে, তার সন্ধান দিতে হবে। বিশ্ববাসী সে অনির্বচনীয়তার উৎসে অবগাহন ক'রে অমর হ'য়ে সজ্ঞানে চোখ মেলে বলবে—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল—

সে-রূপের ব্যাখ্যান ক'রে ক'রে সে জন্ম-জন্মান্তর নবীনতা লাভ করবে—বিশ্ববাসী গর্বোন্নত শিরে আবার একবার বল্‌বে যে তারা হচ্ছে—অমৃতস্য পুত্রাঃ।

BIKRAM COLLEGE LIBRARY

গীতি-কবিতা

যখন রেলওয়ে হয়নি, টেলিগ্রাফ হয়নি, খাওয়া পরার সংগ্রাম আজকার মতো এমন কঠিন হয়ে ওঠে নি, তখন মানুষের দিনটা আর মনটা ভরে থাকত অনেকখানি অবসর দিয়ে—আর সেইটে ছিল মহাকাব্যের যুগ। কোন গোলমাল নেই—দিব্যি নির্ব্বিঘ্নে নিশ্চিন্ত হয়ে লিখে যাও—সর্গের পর সর্গ, পর্ব্বের পর পর্ব্ব—ছাপাখানার তাগিদ্ নেই, পাঠকের "দেহি দেহি" রব নেই—শুধু লিখে যাও, যতদিন খুসি —দশ বছর, বিশ বছর, পঁচিশ বছর ধরে লিখে যাও—শুধু লিখিবারই আনন্দে রে। কিন্তু আজকাল যখন আমাদের খাওয়া পরা জোগাড় করতেই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কুড়ি ঘণ্টা কেটে যায়—যখন জগতটা এমনি বেগে চলেছে যে, সেই চলার মাঝে কারও এমন সাধ্য নেই যে দু' দণ্ড স্থির হয়ে বসে থাকে—তা ছাড়া যখন ছাপাখানার উদর পূরণ কর্‌তে হবে—পাঠকদের মাসিক বরাদ্দটা মিটিয়ে দিতে হবে—তখন গীতি-কবিতাই হচ্ছে প্রশস্ত। কঠোর জীবন-সংগ্রামের মাঝে কোন রকমে একটু সময় করে নিয়ে গোটাকয় লাইনে ছন্দ তাল মান লাগিয়ে একটা কিছু লিখে ফেল—নইলে উপায় নেই—পরমূহূর্ত্তে কিসের ধাক্কায় যে কোথায় গিয়ে পড়বে তার ঠিক নেই। রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তেই হয়ত গুন্ গুন্ করে একটা কিছু রচনা করে

ফেল্‌লে—নইলে উপায় নেই—এমনিই কাল। তাই এইটে হচ্ছে গীতি-কবিতার যুগ। কিন্তু তাই বলে যে মহাকাব্যের যুগে কেউ গীতি-কবিতা লিখলে সৃষ্টিটা ধ্বংস হয়ে যাবে কিম্বা গীতি-কবিতার যুগে মহাকাব্য লিখলে তাকে পিনাল কোডের ধারায় পড়তে হবে এমন কোনো কথা নেই।

কিন্তু ওটা গেল বাহিরের কথা। আর এটা বোধ হয় সবাই মানবেন যে মানুষের বাহিরটা দিয়ে তার ভিতরটা গড়ে ওঠে না—তার ভিতরটা দিয়েই তার বাহিরটা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই এর একটা ভিতরের কারণও আছে—যে কারণটাই হচ্ছে আসল কারণ। সে কারণটা হচ্ছে এই যে, মহাকাব্য লিখতে হলে লেখকের যে মানস-জগত চাই—যে mentality দরকার, মানুষের সেই মানস-জগত থেকে সরে পড়েছে—সেই mentality-টা সে হারিয়ে ফেলেছে।

মহাকাব্য লিখতে হলে যে-সব উপাদান দরকার, সে সব উপাদান আর মানুষের মনে প্রাণে অন্তরে মিল্‌ছে না। সেই বীরত্ব শূরত্ব শৌর্য্য বীর্য্য সেই classical heroism আর মানুষের প্রাণে নেই। বল্‌ছি না যে আজকার মানুষ ভীরু বা কাপুরুষ কিম্বা মরতে ভয় পায়। না, তবে যখন যুদ্ধটা চলে বুদ্ধি আর বিজ্ঞান দিয়ে—যেখানে দু' মাইল দূর থেকে একটা বোতাম টিপে দিলেম আর কামানটা ফায়ার হয়ে গেল, সেখানে সিংহবিক্রম ততটা প্রয়োজন নেই যতটা আছে ঠাণ্ডা মাথার। আজকার মানুষও যে সাহসী সে সম্বন্ধে কোন ভুল নেই। কিন্তু তার সাহসটা কল-কব্জা দিয়ে

এমনি করে নিয়মিত যে, সে-সাহস বুদ্ধির কোঠায় পড়ে একেবারে বেকার বসে আছে, তার প্রাণ অধিকার করে আর তার বীরমূর্ত্তি ফুটিয়ে তুলতে পারছে না। আর যেটা প্রাণ দিয়ে অনুভব করা না যায় সেটা কলমের আগা দিয়েও বেরোয় না, যদি বা বেরোয় তবে সেটা মুখের কথা হয়েই বেরোয়। আর মুখের কথার স্থান কাব্যে ত নেইই—আর যেখানেই থাক। মুখের কথায় চিঁড়ে যদি বা ভেজে—মানুষের মন ভেজে না কিছুতেই। আর ঐ শূরত্ব বীরত্ব heroism ছাড়া মহাকাব্য ভাল জমে না—এটা বোধ হয় সর্ব্ববাদীসম্মত। তাই মহাকাব্যের যুগ আর নেই।

এই ডেমোক্রেসির যুগে মানুষের মনের মধ্যে আর আভিজাত্যের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। যখন মেটারলিঙ্ক পড়ি তখন দেখি সেখানে রাজার কথায় আর রাজ-ভৃত্যের কথায় বড় বিশেষ তফাৎ নেই। ডেমোক্রেসির আবহাওয়াতে রাজাও আর রাজা নেই, রাজভৃত্যও আর রাজভৃত্য নেই। সেই আবহাওয়াতে বাস করে' লেখকের মন থেকেও রাজা আর রাজভৃত্যের ভেদ প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। লেখকের মনে প্রাণে যেটা নেই তার লেখায় সেটা জীবন্ত হয়ে বেরিয়ে আস্তে পারে না কিছুতেই—কারণ মানুষ মুখে যে কথাই বলুক না কেন তার আসল তাৎপর্য্য হচ্ছে তার অনুভবের ভিতরে। আর মহাকাব্য হচ্ছে প্রধানত হয় দেবরাজ্যের নয় আভিজাত্যের গান। শৌর্য্য বীর্য্য বীরত্ব ধীরত্ব গম্ভীরত্ব—সব বিষয়ে, ফরাসীতে যাকে বলে grandeur তাই সেখানে জীবন্ত করে

ফুটিয়ে তোলা চাই। নইলে মহাকাব্যের মহাকাব্যত্বই নষ্ট। তাই দায়ে পড়েই মহাকাব্যের যুগ চলে গেছে।

কিন্তু ওটা গেল অভাবের দিক—যে জন্যে মহাকাব্য আর লেখা হচ্ছে না তার negative side। উপরন্তু মানুষের একটা ভাবের দিক—positive side আছে, যার গুণে গীতি-কবিতা লেখা চলছে। সেটা হচ্ছে এই যে মানুষ বুঝেছে যে তার ভিতরটা তার বাহিরটা থেকে বড়। সে আজ বাহিরের ঘটনাবলীকে দেখতে ততটা ভালবাসে না যতটা ভালবাসে তার অন্তরের লীলা দেখতে। তাই আজকার কবির আর ভার্জিলের মতো Arma virumque cano—I sing of arms and heroes বলে সন্তোষ নেই—সে আজ চায়—

যে গান কানে যায় না শোনা
সে গান যেথায় নিত্য বাজে
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব
সেই অতলের সভামাঝে—

সে আজ চায় অন্তরের এক একটি সুর ধরে, এক একটি অনুভব ধরে, তারি মূর্ত্তি ছন্দে অর্থে তালে ফুটিয়ে তুল্‌তে। আর সে জন্যে গীতি-কবিতাই প্রশস্ত। তাই এটা হচ্ছে গীতি-কবিতার যুগ।

(২)

গীতি-কবিতা বলি সেইটেকে যেটার স্বরূপ হচ্ছে কিছুটা কবিতা আর বাকিটা গীত। গীতি-কবিতার উৎকৃষ্টতা নির্ভর

করবে এর ওপরে যে সে কবিতার অর্থ কতখানি তার কথা-গুলোকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে উঠেছে—ঠিক গানের মত। কারণ গীতি-কবিতার প্রাণ যেটা সেটা তার কথার অর্থের মধ্যে ততটা নেই যতটা আছে তার ভাবের সঙ্গীতের মধ্যে। ভাবের সঙ্গীত বলছি এই জন্যে যে, সঙ্গীত জিনিসটার মধ্যে কি শেষে কোন দাঁড়ি টানা নেই—অর্থাৎ গান জিনিসটার আরম্ভ থাক্‌লেও এর শেষের দিকটায় একটা dash একেবারে ad infinitum পর্য্যন্ত টানা। আর এই জন্যেই বোধ হয় উঁচুদরের গীতি-কবিতা অনেকের কাছে অস্পষ্ট বলে' মনে হয় এবং অনেকে তা বস্তুতন্ত্রহীন মনে করেন কারণ ও জিনিসটাই এম্‌নি যে ওর মানে কোনখানেই শেষ হয় না। যে গীতি-কবিতাটা তার কথার সঙ্গে সঙ্গে ভাবেরও দাঁড়ি টেনে বসেছে সেটা অর্থ হিসেবে যতই স্পষ্ট হোক্ না কেন গীতি-কবিতা হিসেবে তার মান খর্ব্বই হবে। কারণ গীতি-কবিতার প্রাণই হচ্ছে ভাবের সঙ্গীত। আর সঙ্গীত জিনিসটার শেষের দিকে দাঁড়ি টানা নেই। এই কথাটা আরও একটু বিশদ করে' বলবার চেষ্টা কর্‌ব।

যখন বইটা খুলে' চোখ দুটো বুলিয়ে যাই
তোরা শুনিস্‌নি কি শুনিস্‌নি তার পায়ের ধ্বনি
ঐ যে আসে আসে আসে!
যুগে যুগে পলে পলে দিন রজনী
সে যে আসে আসে আসে।

তখন বেশ বুঝ্‌তে পারি যে ঐ চার লাইনের মধ্যে সব

চাইতে যা উপভোগ করছি সেটা হচ্ছে তার না-আসাটা। "সে যে আসে আসে আসে"র সঙ্গে সঙ্গে তার আসাটা বাস্তবিক শেষ হ'য়ে যায় নি—এই হচ্ছে পাঠকের সবার চাইতে আরামের খবর। ঐ যে "আসে আসে আসে"র পরে ছাপায় দাঁড়ি থাকলেও তাতে মনের পাতায় কোন দাঁড়ি পড়ে না সেইটেই হচ্ছে পাঠকের সবার চাইতে বড় লাভ—আর সেইটে হচ্ছে এর প্রাণ। "যুগে যুগে পলে পলে দিন রজনী সে যে আসে আসে আসে" ; কত দীর্ঘ যে সে রাস্তা—সে যে কতদূরে —কোন দিগন্তের কোন পার থেকে যে সে আস্‌ছে—কোন্ অনন্তের ভিতর দিয়ে যে সে হেঁটে চলেছে—যে তাতে মনটাও একেবারে অনন্তের পথে উধাও হয়ে যায়—আর এইটেই হচ্ছে পাঠকের সবার চাইতে বড় লাভ। কিন্তু "যুগে যুগে পলে পলে দিন রজনী" যে চলে' আস্‌ছে সে যদি হঠাৎ একদিন গোঁফে চাড়া দিয়ে এসে কবির সম্মুখে দাঁড়িয়ে যেত তবে সেটা আর গীতি-কবিতা থাকত না, সেটা হ'য়ে পড়ত রয়টারের তারের খবর—একেবারে চাক্ষুষ, জাজ্জ্বল্যমান, নিরেট অর্থযুক্ত,—আর তারপর যদি সে পকেট থেকে একটা চুরুট বের করে' সেটা খেতে খেতে চাষ আবাদের খবর জিজ্ঞেস করত তবে ত কথাই নেই—সেটা যে হ'ত ভীষণ ভাবে বস্তুতান্ত্রিক তাতে সন্দেহ নেই—কিন্তু গীতি-কবিতার তাতে লাভের চাইতে ক্ষতি হ'ত অনেক বেশী, কিন্তু তার চাইতেও বেশী ক্ষতি হ'ত পাঠকদের। কেন ?—সেটা বলছি।

মানুষের অন্তরে দুটো সুরের তার রয়েছে। তার একটাতে

বাজে সান্তের সুর আর একটাতে গুপ্ত হয়ে রয়েছে অনন্তের সুর। আমরা কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এর মধ্যে ঐ সান্ত সুরটাই নিশিদিন বাজিয়ে চলেছি কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে কারণে অকারণে সময়ে অসময়ে ঐ অনন্তের সুরটাও কারও কারও অন্তরে এক একবার করে' ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। আর ঐ অনন্তের সুরটা মানুষের অন্তরে মাঝে মাঝে ঝঙ্কার দিয়ে এসেছে বলে' মানুষ আজকার যা তাই। নইলে সেই আদিম কালের অন্ধকার যুগে তীর ধনুক দিয়ে বন্য পশু শীকার কর্‌তে কর্‌তে তার হাতে কড়া পড়ে' যেত কিন্তু তার মনের গায়ে কোন দাগ পড়্‌বারই অবসর পেত না।

কেবল তাই নয়। এই অনন্তের সুর মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে বলে আমরা সাহস করে ভাবতে পারি যে বাস্তবিক আমরা তেমন বদ্ধজীব নই—আমাদের একটা মুক্তির দিকও আছে। এই যে রক্তমাংসের শরীর তা যতই নিরেট হোক না কেন, যতই চাক্ষুষ, যতই জাজ্জ্বল্যমান, যতই শক্ত হোক না কেন, আমরা তার মধ্যেই শেষ হয়ে যাই নি। আমাদেরও একটা দিক আছে যে দিকটায় দিগন্তের বাতাস বয়ে যায়—অনন্তের আলো ছেয়ে যায়। এই দিকটা মানুষের অনন্ত আশার অফুরন্ত আকাঙ্ক্ষার দিক। আর তার এই অফুরন্ত আশা আকাঙ্ক্ষার দিকটা আছে বলে হাজার হাজার যুগ কাটিয়ে এসেও মানুষের বাঁচা, তাও শেষ হয়ে যায় নি—অর্থশূন্য হয়ে যায় নি। আজও তার কত ভাববার কত করবার আছে। যেদিন মানুষ তার এই অনন্তের দিকের গোড়ায় এসে

পৌঁছিবে—সেদিন থেকে তার বাঁচাটা হবে ঝক্‌মারি পূর্ব্ব-জীবনের জাবর কাটা—সেদিন আসবে মহাপ্রলয়—সেদিন সব মুছে ফেলে আবার মানুষকে সেই গোড়া থেকে সুরু কর্‌তে হবে।

এই যে অনন্তের দিক, মুক্তির দিক—এইটে হচ্ছে মানুষের বৃহত্তর আনন্দের দিক। এই বৃহত্তর আনন্দের দিকটা যার জীবনে যত বেশী প্রকাশ পেয়েছে মানবজন্ম তার তত বেশী সার্থক হয়েছে। কারণ "মানব" নামক যে সম্পাদ্য প্রতিজ্ঞাটি তার সাধারণ সূত্র হচ্ছে—

সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।

আর তার স্বীকার্য্য (postulate) হচ্ছে—"রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ-রতন আশা করি।"

বলেছি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা সান্ত সুরটাই বাজিয়ে ত চলেছি। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন—যাঁদের মধ্যে—পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির জন্যেই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক্—ঐ অনন্তের সুরটা অকারণেই বেজে ওঠে। আর এই সব লোকই মানব সমাজে অন্যান্য লোক থেকে অসাধারণ হ'য়ে ওঠে! কেউ বা কবি, কেউ বা চিত্রকর, কেউ বা গায়ক কেউ বা আর একটা কিছু। কিন্তু আমরাও আমাদের অন্তরে মাঝে মাঝে ঐ অনন্তের ঝঙ্কার না শুন্‌লে প্রাণে বাঁচি নে। ঐ বৃহত্তর আনন্দের দিকটার হাওয়া মাঝে মাঝে প্রাণে না লাগলে আমাদের জীবনটা হয়ে ওঠে একঘেয়ে—দুর্ব্বিসহ। তাই কবিকে ডেকে বলি—হে কবি

এমন কিছু লেখো যার ছন্দে অর্থে ঝঙ্কারে আমারও অন্তরে অনন্তের তারটি ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌বে। চিত্রকরকে ডেকে বলি—হে চিত্রকর এমন কিছু আঁকো যার রেখায় বর্ণে সৌন্দর্য্যে আমার অন্তরে যে অনন্তের ছবিখানি আছে তা মূর্ত্তি পাবে। গায়ককে বলি—হে গায়ক এমন কিছু গাও যার সুরে সুরে আমার হৃদয়ের অনন্তের সুরটাও পরতে পরতে খুলে যাবে। এই যে কবি চিত্রকর গায়ক প্রভৃতি—এঁরা মানুষকে তাদের এই সবার চাইতে অনির্ব্বচনীয় জিনিসটি পাইয়ে দেন বলে' লোকের কাছে তাঁদের এত সম্মান—সমাজ তাঁদের এমন ভক্তি শ্রদ্ধা করে। আমরা গীতি-কবিতার কাছ থেকে ঐ অনির্ব্বচনীয় জিনিসটি পাবার আকাঙ্ক্ষা করে' বসে থাকি। যেন তার ছন্দ অর্থ সুর আমাদের কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে' সেখানে এমন একটা জগতের সৃষ্টি করে যে—জগতে আমি আমাকে পাই বৃহত্তর করে' মুক্ততর করে'—যেখান থেকে ভূমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর্‌তে কোন রকম লজ্জা পাই নে। আর সেই জন্যেই বলছি যে গীতি-কবিতা যদি তার পাঠককে ঐ জিনিসটি পাইয়ে না দেয় তবে গীতি-কবিতার যত ক্ষতি হোক্ না হোক্ তার চাইতে বেশী ক্ষতি পাঠকদের। আর গীতি-কবিতা পাঠককে ঐ জিনিসটি পাইয়ে দিতে পারে না—যদি না তার অর্থ তার কথাগুলোকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে যায়—যদি না তার শেষের দিকে একটা ভাবের dash একেবারে ad infinitum পর্য্যন্ত টানা থাকে।

অন্তুতপক্ষে গীতি-কবিতার যে ক্ষুদ্র দেহ—সেই ক্ষুদ্র দেহের

মধ্যে একটা বৃহৎ হৃদয়ের—একটা গভীর হৃদয়ের পরিচয় থাকা চাই—যে হৃদয়ের সংসর্গে এসে পাঠক তার আপনার হৃদয়টারও বৃহত্ব গভীরত্ব টের পেয়ে যায়—নইলে গীতি-কবিতার অনেকখানিই ব্যর্থ।

ভারত-ইতিহাসের খসড়া

যেদিন জলধিগর্ভ হতে ভারতভূমি আপনার মস্তক উত্তোলন করলেন সেদিন বুঝি অন্তরীক্ষে অন্তরীক্ষে দেবতারা সহর্ষে আনন্দ-ধ্বনি করে তাঁর অভিনন্দন করেছিলেন—আকাশ পথে দিব্যাঙ্গনারা বিচরণ করতে করতে থেমে গিয়ে তাঁদের আনন্দ-পুলকিত আঁখি নত করে একবার চেয়ে দেখেছিলেন—গন্ধর্ব কিন্নর, যক্ষ রক্ষ শূন্যপথে সব মিলিত হয়ে কৌতূহলোদ্দীপ্ত চিত্তে জোড় করে এ ধরিত্রীর পানে চেয়ে প্রণত হয়েছিল। সেদিন উর্দ্ধে অধঃ, পূর্ব্বে পশ্চিমে ঘোষিত হয়ে গিয়েছিল যে এই ভারতবর্ষে বিশ্ব মানবের এক মহালীলা সংঘটিত হবে।

* * *

তারপর কে জানে কত যুগ ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালে জগত-জননী ভারতভুমি আপনার অন্তর বাহির অতুল ঐশ্বর্যে ভরে তুলেছিলেন—আপনার লোভাতুর সন্তানদিগকে আপনার বুকে ভুলিয়ে আনবার জন্যে। পদতলে তাঁর সফেন তরঙ্গ-পাগল সিন্ধুর অতল তলে কোটি কোটি শুক্তি-হৃদয় মুক্তায়

মুক্তায় ভরে উঠল—খনিতে খনিতে কত মণি-মাণিক্য লালসাময় জ্যোতিঃ বিকীরণ করে চকমক করে উঠল—কলনাদিনী গঙ্গা সিন্ধু কাবেরীর তীরে তীরে স্নিগ্ধ শ্যামল বৃক্ষতল সুস্নিগ্ধ ছায়ায় ছায়ায় ভরে গেল—বসুমতী আপনার বুক চিরে অনন্ত স্নেহরসে অভিষিক্ত অপর্য্যাপ্ত অন্নদান করবার জন্যে প্রস্তুত হলেন।

* * *

তারপর কে জানে কোন্ সুদূর অতীতের একদিন, কোন্ এক চিরতুষারাবৃত, চিরকুয়াশাচ্ছন্ন দেশে জগত-জননী ভারত মাতার প্রথম আহ্বান গিয়ে পৌঁছল। মানুষের স্মৃতির পটে বিলুপ্তপ্রায় সেই অভিযান কাহিনী কে জানে? কে জানে কত মরুর নিষ্ঠুর বক্ষের উপর দিয়ে কত কত পর্ব্বতমালার দুরারোহ অভ্র-চুম্বিত চূড়া অতিক্রম করে, কত গহন বন কান্তারে গোপন পথ খুঁজে খুঁজে, কত বৎসর পরে এই কলনাদিনী নদী-সিক্ত ছায়া-স্নিগ্ধ জগন্মাতার শ্যামল বুকে নিবিড় নীল আকাশের তলে পৌঁছে গিয়েছিল মানব-সভ্যতার সেই প্রথম পুরোহিতের দল—উন্নত শির, প্রশস্ত ললাট, বিশাল বক্ষ, তেজোপুঞ্জ দৃষ্টি, সরল সবল কলেবর। মানব সভ্যতার প্রথম পুরোহিত ব্রাহ্মণ-বেশে জগন্মাতার বুকে এই বিশ্বমানবের মহালীলার প্রাঙ্গনে প্রবেশ করল।

* * *

আজ আমি আমার মানস নয়নে দেখতে পাই যে, সেই চির-তুষারাবৃত চির-কুয়াশাচ্ছন্ন দেশ ছেড়ে যেদিন সেই সিন্ধুতীরে

তাঁদের চোখের সামনে পূর্ব-দিগন্ত কনক রাগে রঞ্জিত ক'রে, জবাকুসুম-সংকাশ কাশ্যপেয় মহাদ্যুতি ধীরে ধীরে দিক-চক্রবালের নিচ থেকে আপনাকে তুললেন, সেদিন কি এক অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়ে তাঁদের চিত্ত মন প্রাণ সব ভরে উঠেছিল। সেই মহাদ্যুতির করস্পর্শে পৃথিবীর অন্ধকার দূর হল। মানুষের মনের অন্ধকার দূর হবার সূত্রপাত হল সেদিন, বিশ্বমানব-ইতিহাসের সে এক জ্যোতির্ম্মণ্ডিত চিরস্মরণীয় দিন।

* * *

হিন্দুর সেই এক দিন গিয়েছে যেদিন পঞ্চনদতীর-ভূমে বনে বনে তাপস-কবির আনন্দোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সাম গান শুনে তরুলতা মুঞ্জরিত হয়ে উঠত—বৃক্ষে বল্লরীতে ফুল ফুটে উঠত। সেই ছায়া-সুনিবিড় বনে বনে সারা দ্বিপ্রহর আর মধুপ-গুঞ্জনের বিরাম নেই—বনকপোতের প্রাণ উদাস করা ডাকের আর অন্ত নেই—বৃক্ষতলে শুষ্ক পত্রপুঞ্জে মর্ম্মর ধ্বনি তুলে সর্ সর্ করে বাতাসের আনাগোনার আর বিরতি নেই ; সেই বনভবনে শান্তি-সমাকুল পূর্ণকুটীরে কত কত ঋষি এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটন করবার জন্য ধ্যানে নিরত। হিন্দুর জীবনের ইতিহাসে সেই একদিন গিয়েছে।

* * *

ধীরে ধীরে—ধীরে ধীরে মানুষ আপনাকে চিনল—আপনার অধিকার বুঝল। আনন্দে বিশ্বাসে শ্রদ্ধায় তাদের সকল হৃদয় ভরে উঠল। তাদের কণ্ঠ-সঙ্গীত পঞ্চনদের তীরে

তীরে ছায়া-সুনিবিড় বনে বনে অনন্ত আকাশকে মুখরিত পুলকিত আকুলিত করে তুলল। আপন প্রাণের অদম্য আনন্দ উচ্ছ্বাসে তারা পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করল। অন্ন আপনাকে বহু করলেন—প্রজা বহু হল। পল্লীর প্রতিষ্ঠা হল—নগর নগরী বিনির্ম্মিত হল—রাজ্য গঠিত হল, সাম্রাজ্য স্থাপিত হল—মানুষ আত্মবলে আপনাকে জয়যুক্ত করে ভগবানকে সার্থক করে তুলল।

* * *

তারপর কত যুগ ধরে এই জগন্মাতার বুকের উপর একে একে কত লীলা হয়ে গেল—কত জ্ঞান শক্তি, ঐশ্বর্য সম্পদ, কত মহত্ব গৌরব—কত ঘাত প্রতিঘাত, শান্তি সংগ্রাম—কত রক্তস্রোত প্রীতিধারার ভিতর দিয়ে বসুন্ধরা তাঁর সন্তানদের নিয়ে চললেন—হিন্দুর সে জীবনের কাহিনী আছে মানবের স্মৃতিতে বিলুপ্তপ্রায়।

* * *

অনন্ত অতীতের মসীময় অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনী-প্রভাতে ইতিহাস যখন বিস্মৃতির করাল কবল হতে মানুষের লীলা-ধারাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে উষার ক্ষীণ আলোকে লেখনী হস্তে বদ্ধপরিকর হ'ল, তখনো সেই সুদূর অতীতের আধো-আলো আধো-অন্ধকারের মধ্যে তার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় যে আলেখ্য লিখিত হ'ল তাতে দেখি তখনো হিন্দুর গৌরবের দিন গত হয়নি। তারপর ধীরে ধীরে দিনে দিনে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় আলেখ্যরাজি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে লাগল তখনো

হিন্দুর গৌরবের দিন গত হয় নি। তারি একদিন, আজ মনে পড়ে, আসমুদ্র হিমাচল ভারতের নরনারী একপ্রাণে অশোকের ছত্র-পতাকা-তলে সমবেত হয়েছিল। সেদিন দিকে দিকে ভারতের বাণী বহন ক'রে লোক ছুটল। উত্তুঙ্গ ভূধর তাদের গতিরোধ করতে পারল না। অকূল পারাবারের উত্তাল তরঙ্গমালা তাদের পথ করে দিলে। অমৃতের সন্ধান পেয়ে সেদিনের হিন্দুরা সে-অমৃত নিয়ে বিশ্ববাসীর দ্বারে দ্বারে ফিরল।

তারপর তেমনি আর একদিন উজ্জয়িনীর কনক-পুরীতে জগন্মাতা হিন্দুর সভ্যতার যে এক অভ্রভেদী মন্দির গড়ে তুলেছিলেন—ঐশ্বর্য, গৌরব, জ্ঞান, শক্তি দিয়ে ভ'রে তুলেছিলেন—সে-কাহিনী আজও হিন্দুর মনে সহস্র নৈরাশ্যের অন্ধকারের মাঝে স্বর্ণরেখার মতো উজ্জ্বল হ'য়ে আছে। আজ আমি মানস-নয়নে দেখতে পাই সেই সুবর্ণ পুরী উজ্জয়িনী—সেই উজ্জয়িনীর পথে পথে নরনারী কলহাস্যে গতিলাস্যে নির্ভীক উন্নত শিরে বিচরণ করছে—পথ-পাশে পাশে সহস্র বিপণিতে পণ্যরাজির আর অন্ত নেই—সেদিন বাতাসে বাতাসে ক্ষুব্ধ হাহাকারের পরিবর্তে আনন্দোচ্ছ্বসিত কলহাস্য—আকাশে আকাশে খিন্ন দীর্ঘশ্বাসের পরিবর্তে তৃপ্তির সুখান্বিত হিল্লোল—মানুষের অন্তরে অন্তরে মৃত্যুর পরিবর্তে অনন্ত দুরাশা, দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবার শক্তি। মানস-নয়নে আমি দেখতে পাই—সে-দিন উজ্জয়িনীর অসংখ্য চতুষ্পাঠীতে কত কত দিক দেশ হ'তে কত নরনারী এসে জগন্মাতার চরণে শিষ্যবেশে তাঁর অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে দু' একখানি রত্ন নিয়ে আপনাদের ধন্য

মনে করছে। নগর নগরীতে সেদিন উৎসাহের আর শেষ নেই—পল্লীতে পল্লীতে শিশুদের কলরবের আর শ্রান্তি নেই—শস্যশ্যামল সহস্র পল্লীর পাশে পাশে অগণ্য নদীতে নদীতে কল কল ছল ছল হাস্যের আর বিরতি নেই। স্বর্ণ-সিংহাসনে হিন্দু সম্রাট স্বর্ণ ছত্রতলে স্বর্ণ দণ্ড করে দুষ্টের শাসন ও শিষ্টের পালন করছেন—রাজসভা হিন্দুর জ্ঞানে শক্তিতে শ্রদ্ধায় প্রীতিতে অলঙ্কৃত—রাজ-ভাণ্ডার মুক্তহস্ত—ধরিত্রীর এক প্রান্ত হ'তে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত দেবতার আশীর্বাদে সমুজ্জ্বল। সেদিনের ছবি আমি মানস-নয়নে দেখি আর কোথা হ'তে দুই বিন্দু অশ্রুজলে আমার আঁখিপাত সিক্ত হ'য়ে ওঠে।

* * *

তারপর আরও একদিন—শুধু একদিন কেন?—আরও কতদিন—কত বর্ষ—কত শতাব্দী—এই জগন্মাতার বুকে হিন্দু জ্ঞানে, ঐশ্বর্যে, শক্তিতে, ভক্তিতে, কর্মে, ভোগে আপনাকে সার্থক ক'রে তুলেছিল। সেই অতীত কালে তরঙ্গোচ্ছ্বসিত অকূল পারাবারের বুকে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মতো শুভ্র পাল তুলে হিন্দুর অর্ণবতরণী কত কত পণ্য-সম্ভার জ্ঞান-সম্ভার নিয়ে দিগন্তের পরপারে কত কত দেশে ছুট্‌ল—কত কত দেশ হতে অর্ণবযান সপ্তসিন্ধু পার হ'য়ে, কত কত ঐশ্বর্য সম্পদ—কত কত ভক্তি প্রীতি নিয়ে হিন্দুর বন্দরে এসে লাগল। কত যুগ ধ'রে হিন্দু এক হাতে শক্তি আরেক হাতে প্রেম—একদিকে কর্ম আর একদিকে জ্ঞান—একদিকে ঐশ্বর্য আর একদিকে মুক্তি নিয়ে আপনাকে জান্‌ল ও বিশ্ববাসীকে জানাল। তারপর

ধীরে ধীরে হিন্দুর লীলার দিন ফুরিয়ে এলো। জগন্মাতার দ্বিতীয় আহ্বান কোন্ এক নবীন জাতির অন্তরে গিয়ে বাজল।

* * *

হিন্দুকুশের পরপারে একি গুঞ্জন-ধ্বনি আজ শুনি! যবনিকার অন্তরাল হ'তে কত লক্ষ লোকের উৎসাহ-কলরব, প্রাণের হুঙ্কার আজ হিমাদ্রির বিরাট পঞ্জর ভেদ ক'রে মৃদু গুঞ্জনের মতো এ-পারের আকাশ বাতাসকে চঞ্চল করল। কাণ পাত, ঐ কি শোনা যায়—প্রবল কোলাহলের মধ্য হ'তে মাঝে মাঝে প্রবলতর হুঙ্কারে ধ্বনিত হচ্ছে—"লা ইলাহি ইল্লাল্লা মহম্মদ রসুলাল্লা!" গহন তিমিরাবৃত নিশীথের বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গ-সংক্ষুব্ধ সিন্ধুর ঊর্মিমালার মতো কোন্ নবীন জাতি আজ অদম্য প্রাণের বেগে আপনাকে আর আপনার মধ্যে ধ'রে রাখতে পারছে না। তাকে বেরুতে হবে—বেরুতে হবে আজ আকুল স্রোতস্বিনীর মতো—হিমাদ্রির বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে—কানন কান্তার, পল্লী নগরী, মরু গিরি ভাসিয়ে নিয়ে—আপনারই প্রাণের বেগে—গতির আনন্দে—আনন্দের আতিশয্যে। ধীরে ধীরে গুঞ্জন-ধ্বনি স্পষ্ট হ'তে স্পষ্টতর হ'ল—আরও স্পষ্ট—আরও স্পষ্ট—তারপর একদিন হিমাদ্রির বিরাট পঞ্জর ভেদ ক'রে—অর্ধচন্দ্র আঁকা বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িয়ে—উন্মুক্ত-কৃপাণ লক্ষ লোক—জগৎ-পিতার নাম হুঙ্কার করতে করতে সিন্ধুর তীরে তীরে শার্দূলের মতো দেখা দিল। কৃপাণে কৃপাণে সংঘাত হ'ল—শূলে শূলে সংঘর্ষ হ'ল—অশ্ব-খুরোত্থিত ধূলিতে মেদিনী আচ্ছন্ন হ'ল—বিজয়ীর বিজয়-হুঙ্কারে

বিজিতের নিরাশা-চীৎকারে আকাশ বাতাস প্রপীড়িত হ'ল। মানব-শোণিতে ধরণী রঞ্জিত! নদনদীর লোহিতাক্ত কলেবরে হিন্দুর গৌরব-সূর্য ধীরে ধীরে অস্তমিত। মানব-সভ্যতার দ্বিতীয় পুরোহিত ক্ষত্রিয়-বেশে জগন্মাতার বুকে বিশ্ব মানবের মহালীলা-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল।

* * *

তারপর সপ্ত শতাব্দী ধ'রে এই দুই মহাজাতি বিরোধে মিলনে, শান্তিতে সংগ্রামে, ভয়ে ভক্তিতে পরস্পর পরস্পরের কাছে আপনাকে পরিচিত করতে করতে চল্‌ল—পরস্পর পরস্পরকে জয় করতে করতে চল্‌ল। তাই এই সপ্ত শতাব্দী ধ'রে কখনও মহাকালীর তাণ্ডব নৃত্যে দিগদিগন্তে বজ্রশিখা ছড়িয়ে গেল—মেদিনী কম্পমান হ'ল—দেবালয় চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে ধূলিতে মিশিয়ে গেল—মানব-রুধিরে বসুন্ধরা রঞ্জিত হ'ল;—আবার কখনও বরাভয়করা জগতজননীর প্রশান্ত হাস্যে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে বনে বনে ফুল ফুটল—বিহঙ্গ-কাকলীতে কানন-ভূমি মুখরিত হ'ল—দিগন্তপ্রসারী শ্যামাঙ্গিনীর বুকে বুকে শ্যামশস্য আপনার মায়া বিছিয়ে দিল—শান্তির প্রলেপে যত ব্যথা সব মুছে গেল। ধীরে ধীরে মন্দিরের পাশে পাশে মসজিদ্‌ নির্মিত হ'ল—হিন্দুর অন্তরে অন্তরে মুসলমান ফকিরের জন্য আসন পাতা হ'ল। ধীরে ধীরে এই দুই মহাজাতি—হিন্দু মুসলমান—পরস্পর পরস্পরকে চিন্‌ল। বুঝল তারা যে এমন একটা স্থান আছে যেখানে তাদের বিরাট ঐক্য—বুঝল তারা যে সর্বপ্রথমে তারা মানুষ—আর মানুষ মানুষের কাছে যা চায় সেটা সংগ্রামের

মধ্যে নেই—অবজ্ঞার মধ্যে নেই—বিচ্ছেদের মধ্যে নেই, সেটা আছে প্রীতির মধ্যে—মিলনের মধ্যে—শান্তির মধ্যে, মানুষের বিরোধ সে দুদিনের—মানুষের প্রেম সে অনন্ত। যারা একদিন উদ্ধত হৃদয়ে উন্মুক্ত কৃপাণ নিয়ে জয় করতে এলো তারা ধীরে ধীরে পরাজয় মান্‌ল—যারা একদিন শত্রুর বেশে জগন্মাতার বুকে তাণ্ডব নৃত্য কর্‌ল তাদিকে আর একদিন অনন্ত স্নেহে অভিষিক্ত ক'রে জগন্মাতা আপনার সন্তান ক'রে নিলেন।

*　　　*　　　*

সহসা আজ সিন্ধুর কল কল ছল ছল দ্বিগুণতর হ'য়ে উঠল কেন? সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে হিন্দু-মুসলমান বিস্মিত হ'য়ে দেখল পশ্চিম-দিকচক্রবালে পারাবার-বুক তরণীতে তরণীতে ছেয়ে গেছে। পালে পালে প্রভঞ্জনের হাওয়া তাদের ক্ষুধার্ত্ত শ্যেন পক্ষীর মতো সাঁ সাঁ ক'রে ছুটিয়ে চলেছে—হিমাদ্রিসমান তরঙ্গের বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে ক'রে—শুভ্র ফেন-পুঞ্জে-পুঞ্জে বারিধি-হৃদয় আচ্ছাদিত ক'রে ক'রে ছুটে আসছে সহস্র তরণী তাদেরি পানে। ধীরে ধীরে কখন গোধূলি আপনার স্বর্ণাঞ্চলখানি টেনে নিয়ে দূর দিগন্তের গায়ে মিশিয়ে গেল, ধীরে ধীরে সন্ধ্যারাণী এসে দিবসের শেষরশ্মি রেখাটুকু আপনার অসিত অঞ্চলে মুছে নিলেন—তখন সেই আধো আলো আধো অন্ধকারের মাঝে সহস্র তরণী এসে তটে লাগল। হিন্দু-মুসলমান বিস্মিত হ'য়ে দেখল সেই সহস্র তরণীতে এক নবীন মনুষ্য—শ্বেতবর্ণ, নীল চক্ষু, পিঙ্গল কেশ। কৌতূহলোদ্দীপ্ত তারা জিজ্ঞেস কর্‌ল—"তোমরা কে?"

"আমরা বণিক।"

" তোমাদের পণ্য-সম্ভার কি ?"

"পণ্য আমাদের নূতন প্রাণের নবীন উৎসাহ—তরুণ হৃদয়ের অনন্ত দুর্নিবার আশা আকাঙ্ক্ষা—তপ্ত রক্তস্রোত-প্রবাহিত ধমনীর দুরন্ত কর্ম-পিপাসা—ধরিত্রীর সন্তান আমরা—সপ্তসিন্ধুর মানস-পুত্র আমরা।"

হিন্দু-মুসলমান বললে—"তোমাদের পণ্য আমরা জানি না। তাতে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। তবে এ জগন্মাতার দেশ—সবার অবারিত দ্বার। এসো—তোমাদেরও স্থানের অভাব হবে না।" বিদেশী বণিক তার পণ্য-সম্ভার নিয়ে কূলে অবতরণ করল। মানব-সভ্যতার তৃতীয় পুরোহিত বৈশ্যবেশে এ জগন্মাতার কূলে বিশ্ব-মানবের মহালীলা-প্রাঙ্গনে প্রবেশ কর্‌ল।

* * * *

তারপর যখন রজনী প্রভাত হ'ল তখন সেই বিদেশী বণিকদের একদল চমৎকৃত হ'য়ে দেখল যে তাদের অজ্ঞাতসারে কখন তাদের লোহার তুলাদণ্ড সোণার রাজদণ্ডে পরিণত হয়েছে।

* * * *

এখন এই যে তিন মহাজাতি, এই যে হিন্দু মুসলমান ক্রীশ্চান, এই যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, এই তিন মহাজাতিকে মন্থন ক'রে কত হলাহলের পর কবে, কোন্ অমৃত উঠবে তা কে জানে ? তবে অমৃত যে একদিন উঠবেই সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সামাজিক নীতির নমুনা

ওপাড়ার মহেশ তালুকদারের একমাত্র মেয়েটী মালতী এগার বছরে বিয়ে হ'য়ে ও তার মাস ছয়েক পরে বিধবা হ'য়ে বাপের বাড়ীতে এসে আছে। বিধবা হলেও বয়েস থেমে থাকে না। এগার বছরের মালতীরও থাকল না। পূর্ণযৌবন একে একে তার সারা-অঙ্গে জয়-পতাকা উড়িয়ে দিল। চুলের রাশ দীঘল হয়ে তার হাঁটুতে এসে পড়ল—বক্ষ উন্নত হ'য়ে তার বুকের কাপড়ের শাসন মানল না—চোখের তারায় বিদ্যুৎ জড় হ'য়ে উঠতে লাগল—ওষ্ঠাধর সরস হয়ে উঠল—আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তার জীবন ক্রমশঃ শূন্য হ'তে শূন্যতর হ'য়ে উঠতে লাগল।

মালতী খায়-দায় থাকে অথচ তার যৌবন-জয়পতাকার খবর কেউ রাখে না—মহেশ তালুকদারও না, তাঁর গৃহিণীও না, পাড়ার আর দশজনেও নয়—বুঝি সে খবর রাখার দরকারই কেউ মনে করে না। বিয়ে যে মেয়ের হ'য়ে গিয়েছে অথচ স্বামী যার জীবনের দেনা-পাওনা চুকিয়ে দিয়ে বৈতরণী পার হ'য়ে গেছে—সে মেয়ের বসন্তই বা কি আর বর্ষাই বা কি—যৌবনের জয়পতাকাই বা কি আর জীবনের শূন্যতাই বা কি। সুতরাং ও-দিকটায় চোখ বুজে থাকাই সবার পক্ষে আরামের। সুতরাং মালতী খায় দায় থাকে—মহেশ তালুকদারেরও রাত্রে

সুনিদ্রার ব্যাঘাত হয় না এবং তাঁর গৃহিণীর অঙ্গেও ক্বচিৎ কখনও দু'একখানা নতুন অলঙ্কার ওঠে।

কিন্তু মালতীকে আবিষ্কার করল এ-পাড়ার তর্কবাচস্পতির পুত্র নিশানাথ। নিশানাথ বি, এ পরীক্ষা দিয়ে সেই পরীক্ষা ও পরীক্ষার ফল বেরুবার মাঝের সময়টা বাড়ীতে এসে আরাম করছিল। একদিন মালতীর সঙ্গে তার দেখা ঘটে গেল ঘাটে যাবার পথে। মালতীকে সে আগে থেকেই জানত। তার বিয়ে হ'তে দেখেছে, তার স্বামীর মৃত্যু সংবাদও পেয়েছিল। এই বাংলা-দেশে কত মেয়েই ত বিধবা হয়, সেটা আর এমন পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার কি—সে সম্বন্ধে ভাববারই বা কি আছে আর সমস্যারই বা কি আছে? নিশানাথের মনে মালতী বলতে সেই এগার বছরের ছোট্ট মেয়েটীকেই বুঝাত।

কিন্তু আজ ক'বছর পরে মালতীকে সে হঠাৎ দেখলে একটা নতুন অপরিচয়ের ব্যবধান থেকে—এ সেই মালতী বটে অথচ তার সর্ব্ব অঙ্গে একটা নতুন পরিচয় কোন প্রকারের সুবিবেচনার দিকে না তাকিয়েই বিদ্রোহীর মতো জেগে উঠেছে। এগার বছরের ছোট্ট মেয়ে মালতীর বৈধব্যের কথা শুনে নিশানাথের মনে বিশেষ কিছুই জাগে নি কিন্তু আজকার এই মালতীকে দেখে তার বৈধব্য একটা বিভীষিকা বলে' মনে হ'ল—এমন একটি মেয়ের সঙ্গে তার বৈধব্যের কোন খানেই কোন মিল খুঁজে পেল না। তার মনে হ'ল বিধাতা যেখানে সহজ আনন্দে জীবনের রসধারা উজাড় ক'রে ঢেলে দেবার জন্যই মতলব ক'রে ব'সে আছেন সেখানে মানুষ তাকে ঠেকিয়ে রাখে কোন্ সাহসে

আর কোন্ হিসেবে! এ সংগ্রাম ত একদিনের নয়, এক জনের নয়, এক জীবনের নয়—এ সংগ্রাম অনন্তকালের বংশপরম্পরায় সহস্র মনুষ্য-সমাজের। বিধাতার সঙ্গে এই সংগ্রামে কি কোন দিনও মানুষের জয় হওয়া সম্ভব? আর জয় হলেই কি সেটা একটা মস্ত ঐশ্বর্য্য ব'লে হিসেবের খাতায় দাগ দেওয়া চলবে? এমনি স্পষ্ট অস্পষ্ট অনেক কথাই সেদিন নিশানাথের মনে উদয় হ'তে লাগল।

নিশানাথ খানিক ইতস্তত ক'রে অবশেষে ব'লে ফেল্‌ল—"কি রে মালতী।"

কথাটা বলে' ফেলেই তার নিজের কাণে বিসদৃশ লাগল।

এগার বছরের মালতীকে সে ঠিক যে-ভাবে যে-সম্বোধন করতে পারত আজ এই উদ্ভিন্ন-যৌবনা মালতীকে ঠিক সেই ভাবে সেই সম্বোধন ক'রে নিশানাথ তৎক্ষণাৎ বুঝল যে ওর সঙ্গে তার নিজের মনোভাবের কোনই মিল নেই! আসলে আজিকের মালতীকে ঐ রকম অবহেলা-ভরে অবলীলাক্রমে সম্বোধন করা বাইশ বছরের কোন যুবকের পক্ষেই সত্যও নয় শোভনও নয়। অথচ মুখের কথা লেখা নয় যে কেটে আবার নতুন করে' নতুন জিনিস বসান চলে। কাজেই নিশানাথের মুখের কথাটা প্রকাণ্ড অসত্যটাকে প্রকাশ ক'রে মৃত্যুঞ্জয় হ'য়ে রইল। বেচারা নিশানাথ ঐ মিথ্যাটাকে সহজ ক'রে তুলবার মতো আর কোন অনুরূপ মিথ্যাকেই খুঁজে পেল না।

যা-হোক্ মালতী বল্‌লে—"কি নিশুদা, তোমাকে ত বহুদিন দেখি নি—তুমি ত আর আমাদের ওদিকে যাও না।"

মালতী নিশানাথকে নিশুদা ব'লে ডাকলে বটে কিন্তু তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোন অণুটি থেকেই ভগ্নীর অসঙ্কোচ ভাব প্রকাশ পেলো না। বরং নিশানাথের সান্নিধ্যে মালতী তেমন সচেতন হয়ে উঠল যে রকমটা দুষ্মন্তকে দেখে শকুন্তলা হয়ত হ'তে পারত। দু'দিককার এই মিথ্যা কথার অভিনয়ের চেষ্টা একটা সহজ সত্যকে মিথ্যা ত করলই না—বরং পরস্পরের কাছে পরস্পরকে আরও স্পষ্ট ক'রে তুলবারই সাহায্য করল।

নিশানাথ বললে—"না—অনেকদিন আর ওদিকে যাই নি—মহেশ কাকা কেমন আছেন?"

"ভাল আছেন।"

"যাব একদিন তাঁর খবর নিতে।"

* * *

এর পর মহেশ কাকার শারীরিক কুশল নিশানাথের জীবনে এমনি একটা প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় হ'য়ে উঠল যে তিন দিন যেতে না যেতে সে ওপাড়ার মহেশ তালুকদারের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'ল—এবং গ্রামের এই একটি মানুষের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সে এতই সন্দিগ্ধমনা হ'য়ে উঠল যে মাঝে মাঝে গিয়ে নিশানাথ মহেশ তালুকদারের স্বাস্থ্যের তদ্বির করতে লাগল।

ইতিমধ্যে মালতীর জীবনের শূন্যতাটা কুয়াশার মতো একটা সুখের আমেজে অস্পষ্ট হ'য়েউঠেছে—আর নিশানাথের পাঠজীর্ণ পরীক্ষাক্লান্ত জীবনটা একটা মিষ্টি স্নিগ্ধতা দিয়ে ভরে উঠতে লাগল।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে কথা উঠল।

একদিন মহেশ তালুকদার নিশানাথকে বললেন—“বাবা তুমি আর আমাদের এখানে এসো না।

নিশানাথ জিজ্ঞাসা করল—“কেন ?”

মহেশ বললে—“নানা জনে নানা কথা বলে।”

নিশানাথ দ্বিতীয় বাক্যব্যয়টি না ক’রে প্রস্থান করল।

এইখানেই যদি ব্যাপারটা ঠিক নাটক নভেলে প্রায়ই যেমন হয়ে থাকে তেমনি ক’রে শেষ হ’য়ে যেত তবে কোন কথা ছিল না। অর্থাৎ মালতী হয় বিষ খেয়ে নয় জলে ডুবে না হয় আজকালকার দিনে কেরোসিন তেল কাপড়ে ঢেলে পুড়ে ইহলোক থেকে বিদায় নিল আর নিশানাথ হয় সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেল নয় বাল্য-বিবাহের বিপক্ষে ও বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে প্রবন্ধ লিখতে লাগল। কিন্তু সে সব কিছুই ঘটল না। কিন্তু ঘটতে লাগল যা সেটা হচ্ছে নিশানাথ ও মালতীর দেখা সাক্ষাৎ। তবে এখন থেকে আর মহেশ তালুকদারের বাস-ভবনে নয় তার বাইরে।

নদীর ঘাটে যাবার পথে, বুড়ো শিবতলায় ইত্যাদি নানা জায়গায় কোন মন্ত্র বলে যে এই দুটি প্রাণীর সাক্ষাৎ ঘটে যেতে লাগল তা কেউ জানে না—এই দুটি প্রাণী নিজেরাও বলতে পারত না। কিন্তু ঘটনা এই যে দেখা ঘটতে লাগল। আরও বিশেষ কঠিন কথা এই যে এই দেখাসাক্ষাৎ হওয়াতে এদের দু’জনের কাউকেই তাদের পারলৌকিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সশঙ্কিত দেখা গেল না।

মালতীর মুখে চোখে যে একটা কর্কশতার আবরণ পড়েছিল

তা সরে' গিয়ে সব মোলায়েম হয়ে উঠেছে—আর যে নিশানাথকে দেখলে মনে হ'ত যে জীবন বুঝি একটা অনন্ত ক্লান্তি সেই নিশানাথকে দেখলে এখন স্পষ্ট বোঝা যায় যে জীবন একটা অফুরন্ত প্রাণ-প্রকাশের শক্তি।

কিন্তু আরও বেশী করে কথা উঠল।

বিশেষতঃ ভোলা ময়রার রিপোর্টের পর যে সে দুজনকে বারোয়ারী তলার বটগাছটার নীচে সন্ধ্যার আবছায়াতে দেখেছে। সে ত প্রথমে ভূত বলেই ধরে' নিয়েছিল এবং রাম নাম করতে করতে তার চলার বেগ বাড়িয়ে দিয়েছিল কিন্তু দুজনেই হাঃ হাঃ ক'রে হেসে উঠে ডাকতে গিয়ে দেখল ও-পাড়ার ঐ নিশুবাবু আর মহেশ দাদাঠাকুরের মেয়ে মালতী দিদি।

কাজেই আরও বেশী করে' কথা উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে কোন ভাবুকের মস্তিষ্ক থেকে মালতী নামটী সন্ধ্যামালতীতে পরিণত হ'ল। সন্ধ্যামালতী—যা সন্ধ্যাকালে ফোটে নিশার আঁধার বুককে সুরভিত করবার জন্যে—এই হ'ল নামের টীকা।

সুতরাং আরও বেশী কথা উঠল।

কিন্তু গ্রামে ত দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। কাজেই রায়েদের চণ্ডীমণ্ডপে মাতব্বরদের বৈঠক বসল। অনেক বাক্-বিতণ্ডার পর ঠিক হ'ল যে বাচস্পতি তার পুত্রকে শাসন করবে আর মহেশ তালুকদার তার কন্যার কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালনের দিকে কঠিন দৃষ্টি রাখবে।

তালুকদার আর একটি সন্তানের মুখ দর্শনের আশা করছেন।

বাচস্পতি বাড়ীতে ফিরে কঠোর কণ্ঠে পুত্রকে বললেন—"এ কি কথা শুনি রে নিশু?"

পুত্র বললে—"কি কথা।"

"তুই নাকি ঐ মহেশ তালুকদারের মেয়েটাকে—মেয়েটার সঙ্গে…"

নিশানাথ তাড়াতাড়ি বললে—"আমি মালতীকে বিয়ে করতে চাই।"

রায়েদের চণ্ডীমণ্ডপে নানা দুর্নীতির ইঙ্গিতে যে বাচস্পতিকে কাবু করতে পারে নি, পুত্রের ঐ এক কথায় সেই বাচস্পতির বাক্ একেবারে হ'রে যাবার মতো হলো। তিনি দু'চোখ কপালে তুলে মূর্চ্ছা যাওয়া যাওয়া অবস্থায় বললেন—"বলিস্ কি? বিয়ে—ঐ ছুঁড়িটাকে—বিধবা—" আর কোন কথা খুঁজে পেলেন না।

বাচস্পতি কতকটা প্রকৃতিস্থ হ'লে পিতা-পুত্রে অনেক তর্কবিতর্ক বাকবিতণ্ডা হ'ল। কিন্তু পুত্রকে যখন কিছুতেই আপনার মতে আনতে পারলেন না তখন বাচস্পতি ভীষণ ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠলেন। অবশেষে নিজের পৈতা স্পর্শ ক'রে চীৎকার ক'রে বললেন—"তুই যদি এর পর আর মহেশ তালুকদারের মেয়ের ছায়া মাড়াবি তবে এই পৈতে ছুঁয়ে বলছি আমি তোকে ত্যাজ্যপুত্র করব।"

কথাটা গ্রামে রাষ্ট্র হ'য়ে গেল যে নিশানাথ মালতীকে বিয়ে করতে চায়। শুনে গ্রামের মাতব্বরদের রোমহর্ষণ হ'তে সুরু

করল। তাঁদের দৃঢ় ধারণা হ'ল কল্কি অবতারের আবির্ভাবের আর বেশী দেরী নেই।

এর পর দিনের পর দিন যায়, সপ্তাহ হয়, সপ্তাহে সপ্তাহে মাস হয়, মাসও তিন চারটে কেটে গেল, নিশানাথ মালতীর খোঁজে খোঁজে থাকে কিন্তু তার আর দেখা পায় না—না ঘাটের পথে, না বুড়ো শিবতলায়, না বারোয়ারি তলায়—মেয়েটি যেন ধরাপৃষ্ঠ হতে একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে গেছে।

কিন্তু মহেশ তালুকদারের আবাস ভবনের একটি গবাক্ষপথে একটী মুণ্ডিত-মস্তক, রুক্ষ-কান্তি মেয়েকে মাঝে মাঝে দেখা যেতে লাগল যে তার উদাস চোখ দুটীর দূরদৃষ্টি বারোয়ারি তলার প্রকাণ্ড বট গাছটা যেখানে মাথা তুলে আছে সেইখানে বদ্ধ ক'রে নিস্পন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

রায়েদের চণ্ডীমণ্ডপে মাতব্বরদের বৈঠক বসল। সবাই বললে গ্রামের একটা মস্ত ফাঁড়া কেটে গেল।

কৃতান্ত লাহিড়ীর বয়েস যে কত তা কেউ জানে না। গ্রামের wit ব'লে প্রকাশের একটু নাম ছিল। প্রকাশ বলত—"ওঃ লাহিড়ী মহাশয়ের বয়েস ? neither tree nor stone."

লাহিড়ী মহাশয় যখন তৃতীয় পক্ষ করেন তখন এক দিন ভুরু কুঁচকে চোখ দুটো অর্দ্ধেক বুজে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসেব ক'ষে বলেছিলেন যে তাঁর বয়েস ঠিক এই আসছে ভাদ্রে চুয়াল্লিশ পূর্ণ হবে। শুনে প্রকাশ বলেছিল যে লাহিড়ী মহাশয় যখন নিজেই চুয়াল্লিশ স্বীকার গিয়েছেন তবে নিশ্চয়ই তিনি

বনে যাবার বয়েস পেরিয়েছেন। সে আজ প্রায় দশ বছরের কথা।

কিন্তু লাহিড়ী মহাশয়ের আজও চুয়াল্লিশের কোঠা পেরুল না! কেবল তাই নয় যত দিন যেতে লাগল ততই দেখা গেল লাহিড়ী মহাশয়ের মাথার পাকা চুল একেবারে কাঁচা না হোক অন্ততঃ ডাঁসা হ'য়ে উঠছে অর্থাৎ একেবারে কালো না হোক্ কি রকম একটা তামাটে কালো হ'য়ে উঠছে এবং আজকাল তাঁর কোন দাঁতটীকেই স্বস্থান-ভ্রষ্ট দেখা যায় না।

তর্ক বাচস্পতির মেয়ে ক্ষেমঙ্করী এই সবে এগার গিয়ে বারতে পা দিয়েছে। কিন্তু তার শরীর এমনি বাড়ন্ত, স্বাস্থ্য এমনি নিটোল, প্রাণশক্তির ভাণ্ডার এমনি পূর্ণ যে দেখলে চৌদ্দ পনের ব'লে মনে হয়। কৃতান্ত একদিন মেয়েটীকে দেখে বাচস্পতিকে বললেন—"বাঃ আপনার মেয়েটী ত বেশ ডাগর হ'য়ে উঠেছে।"

বাচস্পতি তাড়াতাড়ি বললেন—"ডাগর আর কি—এই ত এগার গিয়ে কেবল বারোতে পড়েছে।"

কৃতান্ত একটু বাঁকা হাসি হেসে বললেন—"বাচস্পতি মশায় মেয়ের বয়েস ঢেকে ফাঁকি দেওয়া চলে—কিন্তু বুক ঢেকে ত ফাঁকি দেওয়া চলে না। লোকের চোখ ত আছে।"

এরপর অবশ্য কোন বাপেরই মুখ খোলা চলে না।

কৃতান্ত সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"তা মেয়ের বিয়ের কি করছেন?"

বাচস্পতি মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন—"আর দু-এক বছর—"

কৃতান্ত বাচস্পতির কথা শেষ না হতেই বলে উঠলেন—"আর দু-এক বছর বলেন কি বাচস্পতি মহাশয়—এমন মেয়ে—আর কি ঘরে রাখা চলে—লোকে বলবে কি ? আর মেয়েটার দিকেও ত একবার তাকাতে হয়।"

বাচস্পতি আমতা আমতা ক'রে বললেন—"তবে দেখি একটী পাত্র টাত্রর সন্ধান।"

কৃতান্ত অত্যন্ত সহানুভূতির সুরে বলতে লাগলেন—"দেখুন বাচস্পতি মশায় মেয়েকে দূর দেশে পাঠানটা কিছু নয়, বিশেষতঃ আপনার ঐ একটিই মেয়ে এই গাঁয়েরই আশে পাশে যদি কোন গাঁয়ে পাত্রটাত্র পান তারই চেষ্টা দেখুন।" তারপর গলার স্বরটা একটু নামিয়ে বললেন—"আর দেখুন যদি পাত্র নাই পান তবে আমিও গররাজি নই।" বলে' এমনি হাসতে লাগলেন যে যদি তেমন দেখেন তবে যেন কথাটাকে রহস্য বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়।

বাচস্পতির বুকটা ধড়াস করে' উঠল। জমিদার কৃতান্ত লাহিড়ী যার প্রতাপে আশে পাশে পঞ্চাশ ক্রোশের মধ্যে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায় সেই কৃতান্ত লাহিড়ী কি না কৃপারাম তর্কবাচস্পতির কন্যার পাণিপ্রার্থী। কথাটা যেন বিশ্বাস করবারই মতো নয়। বাচস্পতি কিছুক্ষণ কোন কথাই বলতে পারলেন না। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি আমার মেয়েটীকে গ্রহণ করবেন ?"

কৃতান্ত সোৎসাহে উত্তর করলেন—"করব বই কি বাচস্পতি মশায়, ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করা এর চাইতে মহৎ

কাজ আর কি আছে। আর তাও বলি বাচস্পতি মশায় কন্যাদায় উদ্ধারেরই বা কি কথা। আমার অবস্থাও ত জানেন। প্রথম পক্ষের একটী পুত্র হয়ে মারা গেল। দ্বিতীয় পক্ষে খেয়ে না খেয়ে সাত সাতটি মেয়েই হল। হতাশ হয়ে তৃতীয় পক্ষ করলেম কিন্তু তার যে কোন সন্তানাদি হবে তা ত বোধ হচ্ছেনা। অথচ বংশটা ত রক্ষা করতে হবে অবশেষে পিতৃ-পিতামহেরা এক গণ্ডুষ জল পাবে না—সে ব্যবস্থাটা ত ক'রে রাখা চাই। না কি বলেন বাচস্পতি মশায় ?

বাচস্পতি তখন কৃতান্তের বংশরক্ষা বা তাঁর পিতৃ-পিতামহের জল গণ্ডুষের কথা মোটেই ভাবছিলেন না। ভাবছিলেন কৃতান্ত লাহিড়ীর শ্বশুর কৃপারাম তর্ক-বাচস্পতির কথা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মেয়ের কপালের কথা।

কৃতান্তের প্রশ্নে তাড়াতাড়ি বললেন—"তা-ত বটেই, তা-ত বটেই। বংশরক্ষাই ত সকলের আগে—প্রধান কর্ত্তব্য।"

তারপর একটু সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—"দেওয়া থোওয়া সম্বন্ধে—"

কথা শেষ করতে না দিয়ে কৃতান্ত বলে' উঠলেন—"বিলক্ষণ বাচস্পতি মশায়—দেওয়া থোওয়া আবার কি একটা কথা—আপনার যেমন সাধ্য হবে তেমনি দেবেন—আপনার মেয়েই যে সাত রাজার ধন এক মাণিক।"

কৃতান্তের মুখবিবর রসাল হয়ে উঠল।

কথাটা সারা গাঁয়ে রাষ্ট্র হ'য়ে গেল যে কৃতান্ত বাচস্পতির

মেয়ে ক্ষেমঙ্করীকে চতুর্থ পক্ষে অঙ্কশায়িনী করবেন। বাচস্পতির শত্রু মিত্র উভয় পক্ষই ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল। কেউ বললে বাপের কপাল আর কেউ বললে মেয়ের কিন্তু সৌভাগ্য যে সে-সম্বন্ধে কারও কোনও সন্দেহ নেই।

দিন দেখে মহাসমারোহে কৃতান্তের সঙ্গে ক্ষেমঙ্করীর বিয়ে হয়ে গেল। মহা সমারোহ—সানাই বাজল ঢোল কাঁসি কাড়া বিলিতি ব্যাগ পাইপ পর্য্যন্ত।

জমিদার বাড়ীতে সাত দিন ধরে' মহা উৎসব চলল। যাত্রা গান বাই নাচ বায়েস্কোপ ইত্যাদি আশে পাশের পঞ্চাশ গ্রামের লোক এসে শুনল এবং দেখল। সাতদিন ধরে পল্লী-সমাজ একেবারে সরগরম।

কেবল প্রকাশ গান বাঁধল

হায় দেশের হোলো কি দুর্দ্দিন।
কৃতান্ত-কবলে পোলো কচি ক্ষেমী
বাচস্পতি তবু রোলো অশ্রুহীন॥

কিন্তু চব্য চোস্য লেহ্য পেয় আহারে পরিতৃপ্ত মাতব্বরদের মহা বৈঠক বসল রায়েদের চণ্ডীমণ্ডপে। সেখানে তাম্রকূট ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঠিক হ'ল যে লাহিড়ী মশায় একটা মস্ত কীর্ত্তি রেখে গেলেন। গেল দেড়শ বছরের মধ্যে এ গাঁয়ে চতুর্থ পক্ষ কেউ করেনি। আর সে কখন? যখন তাঁর বয়েস প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। বুকের পাটা বলতে হবে একখান!

বিজ্ঞাপন

এই গ্রন্থের **"একটি প্রেমের গান"** ও **"ভারত ইতিহাসের খসড়া"** শীর্ষক লেখা দুটি আমার পূর্ব প্রকাশিত পুস্তক **"সবুজ কথা"** থেকে নেওয়া। বাকি লেখাগুলিও বিভিন্ন সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে **"জীবন-প্রবাহ"** **"বিজলী"**তে **"প্রিয়ে শোনো শোনো"** ও **"গীতি কবিতা"** এই দুটি **"সবুজ-পত্রে"** এবং বাকি সবগুলি **"আত্মশক্তি"**তে ছাপা হয়। এই নিবন্ধগুলির সবই ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বেকার রচনা।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী।

১৯শে নভেম্বর, ১৯৪৮।

অবগুণ্ঠন

সেদিন পেটেণ্ট ওষুধের একটা বিজ্ঞাপন দেখছিলাম। কোন এক ঠাকুরদাদার গঙ্গাযাত্রা করবার ব্যবস্থা হচ্ছিল কিন্তু উক্ত পেটেণ্ট ওষুধের গুণে তিনি নাতিদের সঙ্গে গিয়ে ক্রিকেট খেলা সুরু করে' দিলেন এবং নিরানব্বুইটি "রান" করলেন। কোন পেটেণ্ট ওষুধের কিম্বা আর কোন ওষুধের এমন গুণ কার্য্যকরী হয়েছে কি না তা কোন দিন চোখেও দেখি নি বা কাণেও শুনি নি কিন্তু মানুষের অন্তরলোকে মাঝে মাঝে কোন জগত থেকে যে কে এক যাদুকর একটা কিসের স্পর্শ দিয়ে যায় যার গুণে বয়সেব সকল বর্ষগুলোকে ছাপিয়ে মানস-লোকে সেই চিত্রপটগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে চিত্রপটগুলি কৈশোর-যৌবন বয়ঃসন্ধিক্ষণের অশরীর ঐশ্বর্য্য। হঠাৎ কেমন করে' যে সমস্ত বর্ত্তমান সমস্ত প্রয়োজন সমস্ত হিসাব মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় লুপ্ত হ'য়ে যায় আর তার জায়গায় বহুদূরে-ফেলে-আসা প্রবুদ্ধ-চৈতন্য নিঃশেষে ভুলে যাওয়া নিতান্ত অপ্রয়োজনের দিনগুলি তাদের তুচ্ছাদপি তুচ্ছ স্মৃতিগুলো নিয়ে মনের কিনারে সোনালি আলোর রেখায় উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে তা কেউ বলতে পারে না। সে দিন নেই, সে বয়স নেই, সে ঘটনাগুলো নেই কিন্তু সেই দিনের সেই বয়সের সেই ঘটনাগুলোর সুখস্পর্শগুলি আছে—সে সঙ্গী নেই সে সহচর নেই সে বন্ধু নেই কিন্তু সহসা তাদের

সংসর্গসুখ চিত্তলোকে অপূর্ব্বরূপে সত্য হ'য়ে ওঠে। কোথায় কবে প্রচণ্ড কাঠ-ফাটা রোদে কাঁচা-মিঠে আমগাছের তল্লাসে টো টো করে' ঘুরেছিলেম কোন স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে বকুলবীথির ছায়ায় বসে' এক মনে বকুল ফুলে মালা গেঁথেছিলাম, কোন জ্যোৎস্না রাতে কলরব করতে করতে সঙ্গী-সখা সঙ্গে পথ চলেছিলেম, কোন শান্ত দুপুর বেলা সুবোধ বালকের ম'তো এক মনে কুমোরের দুর্গা প্রতিমা গড়া দেখেছিলেম, কোন গহন রাতে বাড়ী পালিয়ে যাত্রা গান শুনতে গিয়েছিলেম--এই সব ঘটনার সুখগুলো ভীড় করে' তাদের অবদান নিয়ে চিত্তলোকে এসে উদয় হয়। তার তখন জীবনটা একটা নবীনতায় পূর্ণ হ'য়ে যায়—একটা তরুণ্যের স্পর্শ শিরায় শিরায় শোণিত প্রবাহে একটা আনন্দের হিল্লোল তোলে। বয়েসের অবসাদ কোথায় অন্তর্হিত হ'য়ে যায় তার স্থানে সত্য হয়ে ওঠে প্রথম উষার মতো একটা স্নিগ্ধতা একটা সজীবতা—একটা পর্য্যাপ্ত সুখবোধ করবার সহজ সামর্থ্য।

ঘটনা বিশেষ কিছুই নয়। প্রায় বছর কুড়ি পরে রঙ্গালয়ে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলেম। আর সেখান থেকে ফিরলেম ঠিক এমনি একটা স্পর্শ নিয়ে যাতে করে' যখন পাথর বাঁধা রাজপথে এসে পড়লেম তখন মনে হ'ল যেন বয়েস থেকে ঠিক কুড়িটি বছর বিয়োগ হ'য়ে গিয়েছে। কলকাতার রাস্তার যে আনন্দ দেবার ক্ষমতা আছে এর আগে তা কোন দিন মনে লাগে নি—গ্যাসের বাতির যে এতটা দীপ্তি প্রকাশ করবার শক্তি আছে সেটা কোনদিন চোখে পড়ে নি। সেদিন রঙ্গমঞ্চে

আর সবাই হয়ত কেবল দেখছিল "রাজসিংহ" ও "কমলাকান্তের জবানবন্দী"র অভিনয়। কিন্তু আমি সেই সঙ্গে সঙ্গে দেখছিলাম আমার কৈশোরের দিনগুলি। কলেজ, হোষ্টেল, গোলদিঘি, ফুটবল এদের সহস্র ঘটনাবলীর সুখস্পর্শ মনের কিনারে কিনারে যেন মালা গেঁথে চলেছিল। ক্লাব নির্ম্মিত রঙ্গমঞ্চ উন্নততর দৃশ্যাবলী প্রশস্ত প্রেক্ষাগৃহ এদের নতুনত্বের অন্তরের পুরাতন সত্তা যেন আমার কুড়ি বছরের পূর্ব্বের পুরাতন আমির সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে একটা অপূর্ব্ব সুখলোক সৃষ্টি করে' করে' চল্‌ল —বাইরের চোখ-দেখার সঙ্গে সঙ্গে অশরীর কৈশোর যেন আমার অন্তরকে জড়িয়ে নিল।

তাই সেদিন অভিনয় শেষে যখন বাসায় ফিরলাম তখন যদিও দুটো বেজে গেছে কিন্তু রাতের সেই অনুপাতে চোখের পাতায় অবসাদ জড়িয়ে এলো না মোটেই। সারা দেহে তখন একটা সুখের ছোটখাট তুফান উঠেছে। এমন রাতে এমন অবস্থায় ত ঘুম সম্ভব নয়। তাই একটা সিগার ধরিয়ে আরামকেদারায় শরীর এলায়িত করে' দিলেম—কল্পজগতের একটা সুখময় রাজ্যে মনটা উধাও হ'য়ে উড়ে গেল যেখানকার প্রত্যেক ঐশ্বর্য্যটি অতীতের ও আপনার জীবনের।

এই ভাবে কতক্ষণ ছিলেম জানি নে। যখন হুস হল তখন দেখলেম মনটা ঘুরতে ঘুরতে রাতের রঙ্গালয়ের কমলাকান্তের জবানবন্দীতে এসে উপস্থিত হয়েছে। কমলাকান্ত! এক দিন ছিল যখন "কমলাকান্তের দপ্তর" ছিল চিরসঙ্গী। এই এক খানি বই যা বার বার শতবার পড়েও পড়বার প্রয়োজন

নিঃশেষ হয়ে যেতো না যার রস উপভোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতাও মিথ্যা করে তুল্ত না—যার আনন্দ দেবার ক্ষমতা নিবিড় পরিচয়েও অটুট্ থাকৃত। সে আজ প্রায় পনর কুড়ি বছরের কথা। আজ আবার সেই লুপ্ত অতীত যেন সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কমলাকান্তের চিত্ত মন প্রাণ, আশা আকাঙ্ক্ষা রসিকতা নসী বাবু প্রসন্ন গোয়ালিনী মঙ্গলাগাই, যেন একটা নিবিড় বস্তুতন্ত্র রূপ ধরে তাঁদের সংসর্গের মধুরতা স্পষ্ট করে তুলল। আলমারী খুলে বহু অনুসন্ধানে "কমলাকান্তের দপ্তর" বের করলেম। তারপর আরাম কেদারায় পুনরায় দেহ এলায়িত করে সিগারেটের স্নিগ্ধ মধুর নীলাভ-শুভ্র ধূম উদ্গীরণ করতে করতে তারি পৃষ্ঠায় মনসংযোগ করলেম।

"শোন্ প্রসন্ন তোকে একটি গীত শুনাইব।" গীত শোনান শেষ হ'য়ে গেল। তারপর সে গীতের কমলাকান্তের নিজ ব্যাখ্যা তারি সঙ্গে তাঁর দুঃখ সুখ আশা ভরসা কাব্যের রূপ নিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করে চলল। আমি পড়ছিলাম —"চাহিবার এক শ্মশান ভূমি আছে নবদ্বীপ। বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে আমি সেই শ্মশানভূমির প্রতি চাই। যখন দেখি সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম বেড়িয়া সেই কলধৌত বাহিনী গঙ্গা তর তর রব করিতেছেন তখন গঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি—তুমি আছ সে রাজলক্ষ্মী কোথায়? তুমি যাঁহার পা ধুয়াইতে সেই মাতা কোথায়? তুমি যাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে সেই আনন্দরূপিনী কোথায়?" এমন সময় মনে হ'ল দরজায় কে মৃদু করাঘাত করছে। কান পেতে বুঝলেম ভুল হয় নি—

সত্যি কে দরজায় করাঘাত করছে। বললেম—"চলে আসুন এখানে অবারিত দ্বার।"

দ্বার উন্মুক্ত হল। প্রবেশ করলেন এক বৃদ্ধ।

আমি জিজ্ঞেস করলেম—"আপনার নাম ?"

"শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।"

আমি তাড়াতাড়ি উঠে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিলেম যেন এই যে সন ১৩৩৪ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ রাত ৩টা ৫৭ মিনিটে আমার ঘরে কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর আবির্ভাব এর চাইতে স্বাভাবিক ঘটনা অদ্যাপি জগতে কুত্রাপি ঘটে নি—বললেম—"বসতে আজ্ঞা হোক।"

কমলাকান্ত বসলেন। আমি বললেম—"দেখুন আজকাল বিশেষ করে' বড় বড় সহরে তাম্রকূট জিনিসটা নবাব রূপ পরিত্যাগ করে পাশ্চাত্য সভ্যতার "ever fit" রূপ নিয়েছে —যেন জোব্বা আচকান চাপকান ছেড়ে শর্ট ও সার্টের রূপ নিয়েছে, যদি ইচ্ছা করেন ত সিগার বা সিগারেট—"

কমলাকান্ত উত্তর করিলেন—"তার কোন দরকার নেই। বিশেষতঃ হুঁকোর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না।" তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—"ভীষ্মদেব খোষনবিশের কোন সংবাদ রাখেন ?"

"তিনি বহুদিন হ'ল পরলোকে যাত্রা করেছেন এবং আশা করি সেখানে পৌঁছেচেনও।"

"জুনিয়ার খোষনবিশ ?"

"তিনি এখন কাশীবাস করছেন।"

কিঞ্চিৎ ইতঃস্তত করে' কমলাকান্ত বললেন—"কথাটা কি, আমি একটা লেখা ছাপাতে চাই—"বঙ্গদর্শন" বেঁচে থাকলে বোধ হয় ব্যাপারটা সহজ হত—তাই ভীষ্মদেবের সন্ধান করছিলাম।"

আমি বললেম—"আপনার লেখা ছাপাবার জন্যে ভীষ্মদেব বা ভীমসেনের প্রয়োজন হবে না—সম্পাদকেরা লুফে নেবে—আপনার সাহিত্যিক যশ আজও মলিন হয় নি তা জানেন।"

বৃদ্ধের মুখে একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল।

আমি বললেন—"কাগজওয়ালাদের সঙ্গে আমারও একটু জানাশোনা আছে—লেখাটা আমাকেও দিতে পারেন কোন সম্পাদককে পৌঁছে দেব।"

কমলাকান্ত হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—"প্রসন্ন গোয়ালিনীর মতো আপনার ধৈর্য্য আছে?"

আমি উত্তর করলেম—"ধৈর্য্য জিনিষটা মানুষের একটা ঐকান্তিক গুণ বলে মনে করি না। কি বিষয় সম্বন্ধে ধৈর্য্য সেটা জানলে বলিতে পারি উক্ত জিনিসটি আছে কি নেই।"

কমলাকান্ত বললেন—"যদি ঘুমিয়ে না পড়েন তবে আমার লেখাটা আগে আপনাকে পড়ে শোনাই।"

আমি শুধু বল্লেম—"আমার ধৈর্য্যে অন্ত পাবেন না।"

বৃদ্ধ তাঁর অর্দ্ধ মলিন উত্তরীয়ের নীচ থেকে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন বালির কাগজ ও একজোড়া চশমা বের করলেন।

তারপর চশমা জোড়াটি যথাস্থানে সন্নিবেশ করে পড়তে সুরু করলেন।

অবগুণ্ঠন

চিরজীবি হয়ে থাক বঙ্গনারীর অবগুণ্ঠন।

এ পরিবর্ত্তনের দিনে এ নূতনের দিনে হে অবগুণ্ঠন! আজ আমি তোমার যশ ঘোষণা করব—আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী আজন্ম বিবাহশূন্য অহিফেন প্রসাদাৎ তোমার দিব্য স্বরূপের দর্শন লাভ করেছি। তাই আজ আমি তোমার গুণগান করিব। তোমার জয় হোক।

হে অবগুণ্ঠন! তুমি চিরজীবি হয়ে বঙ্গনারীর উপর রাজত্ব করতে থাক। তুমি চিরজীবি হ'য়ে বঙ্গনারীর ঢল ঢল মুখখানির উপরে ঝলমল করতে থাক—তাদের সিঁথীর উপর সিন্দূরাবলুণ্ঠিত হ'য়ে তাদের চেরা চোখের চোরা চাহুনি লুণ্ঠন করতে থাক। দেখো সে চাহুনি আমার সহিত বণ্টন করতে ভুলো না। তোমার জয় হোক।

হে অবগুণ্ঠন! আমি তোমার সঠিক জন্ম তারিখ বলতে পারি নে। কিন্তু একথা ঠিক জানি যে সুরাসুরে মিলে তোমার বন্দনাগানে তোমাকে এ ধরাধামে এনেছে। ধরাধামে এসে সেদিন তুমি তন্ন তন্ন করে' এ পাপ পৃথিবী খুঁজেছিলে তোমার উপযুক্ত আসনের জন্য। কোথায় সেই সৌন্দর্য্য যা প্রথম উষার স্নিগ্ধতার মতো প্রাণ জুড়িয়ে দেয়—বা গভীর রজনীর নক্ষত্র-ব্যাপ্ত আকাশের নিবিড় রহস্যের মত কল্পলোকের

নিরুদ্দেশ যাত্রীটীকে উৎসুক করে' তোলে—যা এই কঠোর সংসারে সহস্র পরীক্ষার মাঝে দেবতার আশীর্ব্বাদের মতো জীবনকে কল্যাণযুক্ত করে! কোথায় সেই সৌন্দর্য্য যা কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে সুখান্বিত দিবসের নিমেষগুলিকে সঙ্গতময় করে—দীর্ঘ রজনীর অন্ধকার মুহূর্ত্তগুলিকে আনন্দ-দীপের সুবর্ণ রশ্মিতে উদ্ভাসিত করে' তোলে। তুমি সেদিন তন্ন তন্ন করে' এই পাপ পৃথিবী খুঁজেছিলে। কিন্তু তোমার সন্ধানের বস্তু কোথাও মিলল না। অবশেষে তোমার দৃষ্টি পতিত হ'ল বঙ্গললনার উপর। অমনি তুমি সেখানে আপনার অধিকার বিস্তার করে' তোমার রাজত্ব স্থাপন করলে। হে অবগুণ্ঠন! তোমার রাজ্য সনাতন হোক্, তোমার রাজভাণ্ডার সমৃদ্ধিশালী হোক্, তোমার রাজত্ব সুখসম্পন্ন হোক্। তোমার জয় হোক্।

হে অবগুণ্ঠন! তুমি তোমার অপযশকারীদের কথায় কান দিও না। তাদের কথায় অভিমান করে এ বঙ্গ-সংসার ত্যাগ কোরো না। জেন' তাঁরা বিলাতী ভাবাপন্ন বাবু। তাঁরা ভাল ভাল সার্ট পরেন বটে কিন্তু আর্ট কি তা জানেন না। তাঁরা বাহিরের হাব ভাব ভ্রূভঙ্গি-বিলাসেই মুগ্ধ হন বেশী। ছু'খানি ব্রীড়াবনত কালো চোখের নম্রনত চাহুনি যা কিছু না বলেও শত কথা প্রকাশ করে তা বুঝবার মতো শক্তি তাঁদের নেই। আজ এই বিংশ শতাব্দীর দানবী আকাঙ্ক্ষারাশি দিকে দিকে যে হুতাশন জ্বেলে দিয়েছে সেই হুতাশনে তাঁদের অন্তর পুড়ে খাক্ হয়ে গিয়েছে। তাই অন্তর দিয়ে অন্তর

ধরবার শক্তি আর তাঁদের নেই। তারা ধুতি ছেড়ে প্যাণ্টালুন পরেন। হুঁকা ছেড়ে বার্ডসাই টানেন। হায়! তাঁদের অহিফেন অপেক্ষা ব্র্যাণ্ডির পছন্দ সমধিক। আর কত বলব? তাঁদের কথায় অভিমান করে' তুমি বঙ্গললনার উত্তমাঙ্গ ত্যাগ কোরো না। তাঁদের অপযশ ভয়ে তুমি তোমাকে সঙ্কুচিতও কোরো না। তাঁরা ঈর্ষাপরায়ণ বাবু। তোমার প্রতি তাঁদের ঈর্ষার কারণ অবশ্যই আছে। তুমি তেমনি দীর্ঘদেহকে লালিত্যপূর্ণ ঢল ঢল কাঁচা মুখারবিন্দের উপর ঝুলিয়ে দাও। ভয় নেই আমি তোমার যশ ঘোষণা করব। তোমার জয় হোক্।

হে অবগুণ্ঠন! যখন তোমার দ্বারা ঈষৎ উদ্‌ঘাটিত করে' দুখানি কৃষ্ণোজ্জ্বল চোখের চপলা-চঞ্চল চকিত চাহুনির কৌতূহলাক্রান্ত দৃষ্টি ক্ষণিকের জন্য মুক্ত হয় তখন ধন্য সেই মহাজন যিনি সেই কৃষ্ণ আঁখিতারা ক্ষণিকের জন্যও দেখে জীবন সার্থক করেন। কোথায় লাগে তার কাছে রঙ্-রঞ্জিত পাউডার-লিপ্ত পরিপাটী সাজ-সজ্জা-ভূষিত শত শত সুন্দরীর জাঁকজমক। তাই দৃষ্টি সরম-বিহ্বল অথচ কৌতূহলাক্রান্ত—তাই দেখবার লোভ সম্বরণ অসাধ্য কিন্তু সে দেখা কেবল বিদ্যুতের গতির ন্যায়—সেই দৃষ্টি হ্যাট-কোট আকিঞ্চন ব্রাণ্ডি-বার্ডসাই-সেবী বিলাতী বাবু কি বুঝ্‌বে? তাঁর কাছে গাছ-আলো করা প্রস্ফুটিত পলাশ ফুলেরই আদর। যে গোলাপটী পত্রান্তরালে নিজেকে গোপন রেখে সৌরভ ছড়াচ্ছে তা তাঁর কাছে গৌণ। তাঁর কথায় অভিমান করে' তুমি বঙ্গললনাকে ত্যাগ করো না। তোমার জয় হোক্।

হে অবগুণ্ঠন! তোমার শক্তি অসীম। তুমি এই বাংলার নরসমাজ ও নারীসমাজ পৃথক রেখেছ। তাই বঙ্গরমণী এমন রহস্যময়ী। তোমার যবনিকার অন্তরালে কি প্রহেলিকাই না নিবিড় রহস্য নিয়ে গুপ্ত হ'য়ে আছে। একখানি মুখ—না জানি সে কি মুখ—সে কি কমলদলসম? দুইটী চক্ষু—না জানি সে কেমন—নীলোৎপলতুল্য? খঞ্জন-সদৃশ? কুরঙ্গিনী লাঞ্ছিত?—নাসিকা অধর ভ্রূ গণ্ড কপোল—একটা সমগ্র কল্পনার রাজ্য তোমার ঐ ক্ষুদ্র যবনিকার অন্তরালে লুকায়িত রয়েছে। সেই যবনিকাকে উত্তোলন করে' সেই কল্পনার রাজ্যকে যে বাস্তবে পরিণত করতে চায় সে নরাধম, তার এ মানব-সমাজে স্থান হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তার সংসর্গে মানব-সমাজ বাস্তবতার স্পর্শে অধঃপতনের মুখেই অগ্রসর হবে। তার অপযশ ভয়ে তুমি শঙ্কিত হোয়ো না। আমি তোমার বন্দনাগান করব। তোমার জয় হোক্।

হে অবগুণ্ঠন! তুমি সমস্ত দিবাবসানে নব বধূটীর মুখখানি চোখদুটী ঢেকে রেখে একটা কি প্রহেলিকারই না সৃষ্টি কর! ঐ যে একটি তরুণী তোমার আবরণে আবৃত হ'য়ে আস্‌ছে যাচ্ছে উঠ্‌ছে বসছে নানা কর্ম্মসম্পাদন কর্‌ছে তা এ জগতের কাছে একটা রহস্যই থেকে যায়,—একটা কল্পনার ভাণ্ডারই থেকে যায়। আর সেই অসূর্য্যম্পশ্যা বধূ যখন রজনী যোগে আপনার শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করে' আপনার প্রাণ ও প্রণয়-বল্লভের কাছে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করে' দেয়' আর যখন সেই স্তব্ধ রজনীতে নিরালা কক্ষে তার প্রণয়-বল্লভ সেই রহস্যময়

তোমার ক্লীব আখ্যা দিয়েছে। তাঁরা নিতান্তই বেরসিক দূরদৃষ্টিহীন। আমি কমলাকান্ত চক্রবর্তী আজন্ম বিবাহশূন্য, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমাতে পুরুষের প্রকৃতিই প্রবল। তাই আমি তোমাকে পুরুষ বলব। তুমি পুরুষ তাই নারী-সমাজেই তোমার আদর, তুমি পুরুষ তাই রমণী-সান্নিধ্যেই তোমার বিলাস। আবার হে অবগুণ্ঠন! তুমি রসিক তাই নববধূ ও যুবতী ললনার সহিতই তোমার ভাব বেশি। তুমি ভদ্র সৎ তাই সম্ভ্রান্ত ললনা ও ভদ্র মহিলাদের সহিতই তোমার ঘনিষ্ঠতা। তুমি নীচ জাতি নীচ সমাজের কাছে ঘেঁস না। ঘেঁসলেও তুমি সর্বদাই সেখানে সঙ্কুচিত হ'য়ে থাক এবং ক্ষণিকের জন্যও অভদ্র ব্যবহার দেখলে তৎক্ষণাৎ তুমি পলায়ন কর। তোমার মন অতি উচ্চ। তোমার সাধু সংসর্গে এ বঙ্গসংসারও সাধু থাকবে। অতএব তুমি থাক—তোমার জয় হোক্।

হে অবগুণ্ঠন! তুমি সিদ্ধ যোগী। তোমার সম্পূর্ণ সমতা লাভ হয়েছে। তুমি সুশ্রী কুশ্রী উভয়কে সমানভাবে আশ্রয় কর। তোমার কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। তুমি সুন্দরীকে অধিকতর সুন্দরী ক'রে তোল। আবার যে কুৎসিতা তাকে পরম যত্নে লোক-লোচনের অন্তরাল ক'রে রাখ। তোমার গুণ আর কত বলব। অতএব তুমি থাক—তোমার জয় হোক্।

হে অবগুণ্ঠন! তুমি বিলাতী বাবুগণের কথায় অভিমান ক'রো না। তাঁরা যে তোমাকেই শুধু বর্জন করতে চান

আমি বাধা দিয়ে বললেম—"প্রথমতঃ সত্য বস্তুটি কারো খাতিরের তোয়াক্কা রাখে না—দ্বিতীয়তঃ সত্যটা কি সেটা নিঃসন্দেহরূপে স্থিরীকৃত হওয়া চাই।"

খানিক থেমে বললেম—"দেখুন সত্য সম্বন্ধে আমার একটা থিওরি আছে।"

কমলাকান্ত বললেন—"আচ্ছা শুনি আপনার থিওরি।"

আমি বললেম—"সত্য এক ও বহু। অবশ্য এটা আমার নিজের কথা নয়, উপনিষদ্ থেকে উদ্ধৃত। সত্য যেখানে এক সেখানকার নাম আমরা দিয়েছি ব্রহ্ম। এইখানকার সত্য হচ্ছে সেই বস্তু যা অক্ষয় অব্যয় পরিবর্তনহীন পরিণামহীন। এখানে ব'সে যদি কেউ বলে—এই্-ই সত্য—তবে, বুঝি। কিন্তু এর নীচে সত্য যেখানে বহু সেখানে সত্যের অনন্ত রূপ অনন্ত নাম অনন্ত বৈচিত্র্য। এখানে দাঁড়িয়ে যদি কেউ বলেন—এইটেই মাত্র সত্য—তবে সেটা বোধগম্য হওয়া একটু কঠিন হ'য়ে পড়ে। কারণ এখানে এক সত্য দিয়ে আর এক সত্য নাকচ করা যায়। আসলে এখানে হামেশাই এক সত্য দিয়ে অন্য সত্যকে নাকচ করা চলছে।"

"সুতরাং ?"

"সুতরাং—সুদীর্ঘ অবগুণ্ঠনের গদ্যময় নাম হচ্ছে অবরোধ—অবরোধ প্রথা। আর এই অবরোধ প্রথা গেল কাল সত্য হ'লেও আসছে কাল আর তা সত্য থাকছে না। স্ত্রী-স্বাধীনতা-সত্য অবরোধ-সত্যকে আজ দেশে ক্রমাগত হটিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং অবগুণ্ঠন-প্রশস্তি এদিনে অচল।"

বৃদ্ধ কমলাকান্ত কথঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হলেন। আমি নির্মম হ'য়ে বললেম—"একটা দেশালায়ের কাঠি দিয়ে আপনার লেখাটার সদ্গতি করা যাক্।"

কমলাকান্ত ব্যস্ত হ'য়ে কি বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর আমার কাণে পৌঁছবার আগেই হঠাৎ দেখি আমার মাথাটা আরাম-কেদারার এক পাশ দিয়ে ঝুলে পড়েছে. "কমলাকান্তের দপ্তর" খানা খোলা অবস্থায় আমার হাত থেকে খ'সে আমার কোলের উপর আশ্রয় নিয়েছে, অর্ধদগ্ধ সিগারটি মেঝেয় প'ড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে—পূর্বাকাশ উদীয়মান সূর্যের পূর্বরাগে রাঙা হ'য়ে উঠেছে—আর আমার নব পোষ্যটি টেবিলের উপর থেকে ম্যাঁও ম্যাঁও শব্দে প্রাতরাশের আবেদন জানাচ্ছে।

আমি তখন তাকে সম্বোধন ক'রে কমলাকান্তী ঢঙে বলতে লাগলাম—"হে মার্জার-নন্দন! হে দুগ্ধ-বিলাসী! হে মৎস্য-প্রত্যাশী! হে আজন্ম-অকৃতজ্ঞ! হে পরার্থপরতা-লেশহীন! তোমরাই সুখী। তোমাদের অবগুণ্ঠনের কোনো প্রশ্ন নেই, সত্য মিথ্যা নির্ধারণের কোনো তর্ক নেই, যুগে যুগে দেশে দেশে আচার ব্যবহার বা রীতি-নীতি বা রুচির যে পরিবর্তনই হোক্ না কেন তাতে তোমাদের কিছুই আসে যায় না।

আমি এই রকমের একটা গুরুগম্ভীর বক্তৃতা দিয়ে মার্জার-নন্দনের নিকট থেকে একটা উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন পাবার জন্যে থামলাম। মার্জার-নন্দন সেই সুযোগে তার তীক্ষ্ণ দু'চোখের

তীব্র দৃষ্টি আমার মুখের উপর স্থাপন ক'রে ব'লে উঠল—"ম্যাঁও।"

তখন আমি চেয়ার থেকে উঠে পড়লাম। উঠে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল টেবিলের উপর কতকগুলি বালি-কাগজ। তার একখানি নিয়ে দেখলেম কি সব লেখা। পড়লেম আরম্ভ হয়েছে—"চিরজীবী হয়ে থাক বঙ্গনারীর অবগুণ্ঠন!"

সমাপ্ত

AMC